আধুনিক ধানের চাষ

অষ্টাদশ সংস্করণ মে ২০১৫

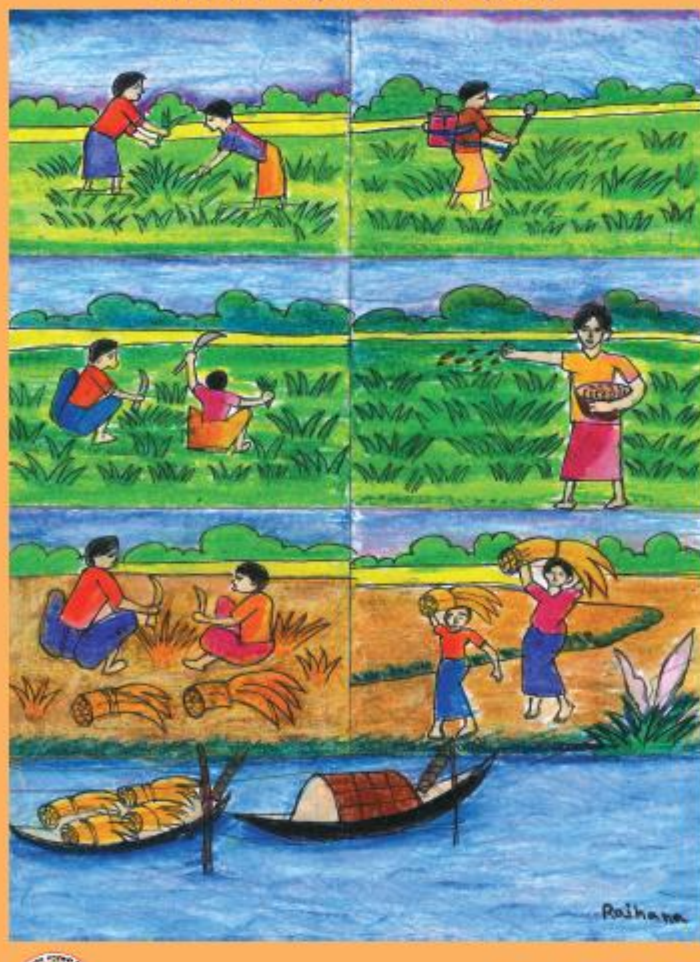

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আধুনিক ধানের চাষ

অষ্টাদশ সংস্করণ মে ২০১৫

উপদেষ্টা মণ্ডলী
ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস
ড. মো. শাহজাহান কবীর
ড. মো. আনছার আলী

সম্পাদনায়
এম এ কাসেম

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)
গাজীপুর ১৭০১

প্রকাশনা নং : ৫
অষ্টাদশ সংস্করণ : ১০,০০০ কপি
মে ২০১৫

প্রকাশক
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর ১৭০১
ফোন : ৮৮-০২-৯২৫৩৮১৫, ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯২৬১১১০
ই-মেইল : brrihq@yahoo.com, dg@brri.gov.bd
ওয়েবসাইট : www.brri.gov.bd, www.knowledgebank-brri.org

অর্থায়নে
IAPP-BRRI (GoB) প্রকল্প

গ্রাফিক ডিজাইন, পেজ মেক-আপ ও প্রুফ রিডিং
মো. ছাইফুল মালেক মজুমদার

প্রচ্ছদের ছবি
রায়হানা বিনতে আশিক

স্বত্ব
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

সাইটেশন
বিআরআরআই ২০১৫, আধুনিক ধানের চাষ, অষ্টাদশ সংস্করণ
BRRI 2015, Modern Rice Cultivation, 18th Edition

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও জনসংযোগ বিভাগ
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), গাজীপুর ১৭০১
ফোন : ৯২৯৪১৪৯, পিএবিএক্স : ৯২৯৪১১৭-২১, ৯২৬৪১১৮, ৯২৬৪১২৭, এক্সটেনশন : ৫২৬
মুদ্রণ : রীতা আর্ট প্রেস, টিকাটুলী, ঢাকা ১২০৩

সূচিপত্র

৫ ভূমিকা
৬ উফশী ও আধুনিক ধান
৬ ব্রি ধানের পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য
১৪ ধান চাষের উন্নত পদ্ধতি
২৩ সার ব্যবস্থাপনা
৩৪ ভেজাল সার চেনার উপায়
৩৬ আগাছা দমন
৪০ সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা
৪৩ ধান চাষে ড্রাম সিডার
৪৫ অনিষ্টকারী পোকা ও মেরুদণ্ডী প্রাণী ব্যবস্থাপনা
৫৭ ধানের রোগ ব্যবস্থাপনা
৬৩ এক নজরে ধানের রোগ শনাক্তকরণ পদ্ধতি
৬৫ ফসল কাটা, মাড়াই ও সংরক্ষণ
৬৬ ধানের ফলন ব্যবধান
৬৮ ব্রি হাইব্রিড ধানের চাষাবাদ পদ্ধতি
৭০ হাওড় এলাকায় আকস্মিক বন্যা মোকাবিলা
৭০ তীব্র শীতে বোরো ফসলের জরুরি পরিচর্যা
৭২ বোরো ধানে অতিরিক্ত চিটা : কারণ ও প্রতিকার
৭৩ ধান আবাদের যন্ত্রপাতি
৭৬ নেক ব্লাস্ট রোগ দমনে আগাম সতর্কতা
৭৭ বাদামি গাছফড়িং দমনে আশু করণীয়
৭৭ ধানের বীজ প্রাপ্তিস্থান
৭৮ ব্রি অনুমোদিত কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারকদের ঠিকানা
৭৮ কৃষিযন্ত্র আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা
৭৯ প্রয়োজনীয় পরিমাপ
৮০ প্রয়োজনীয় টেলিফোন নম্বর

ভূমিকা

ধান আমাদের প্রধান খাদ্য শস্য। তাই এর সাথে দেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঘন বসতিপূর্ণ এ দেশের জনসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলছে, অপরদিকে বাড়িঘর, কল-কারখানা, হাট-বাজার, সড়ক-জনপথ স্থাপন এবং নদী ভাঙ্গন ইত্যাদি কারণে আবাদি জমির পরিমাণ প্রতিনিয়ত কমছে। তদুপরি রয়েছে খরা, বন্যা, জোয়ার-ভাটা, লবণাক্ততা, শৈত্য প্রবাহ, ঘূর্ণিঝড় ও শিলাবৃষ্টির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এসব প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে বেশি ধান উৎপাদন করে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদের লক্ষ্য।

বাংলাদেশ পৃথিবীর ধান উৎপাদনকারী দেশগুলোর মধ্যে চতুর্থ হলেও এখানকার হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৪.৩ টন। চীন, জাপান ও কোরিয়ায় এ ফলন হেক্টর প্রতি ৬-৬.৫ টন। তবে চীন, জাপান ও কোরিয়ায় সারা বছরে একটি মাত্র ধান ফসল উৎপাদন হয়; অথচ বাংলাদেশে একই জমিতে বছরে তিন বার ধান উৎপাদন হয়। সে বিবেচনায় আমাদের ধানের ফলন অন্য দেশের চেয়ে কম নয়। তথাপি দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে ধানের ফলন আরো বাড়ানো ছাড়া কোন বিকল্প নেই। সনাতন জাতের ধান এবং মান্ধাতার আমলের আবাদ পদ্ধতির মাধ্যমে এ চাহিদা পূরণ করা অসম্ভব। এ জন্য প্রয়োজন উচ্চ ফলনশীল (উফশী) ধান ও আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তির ব্যাপক প্রচলন। একই সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যে নতুন চ্যালেঞ্জ সামনে আসছে তা মোকাবিলার জন্য ক্লাইমেট স্মার্ট প্রযুক্তি উদ্ভাবন একান্ত জরুরি।

বাংলাদেশে ১৯৬৮ সালে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইরি) থেকে প্রথম উফশী জাতের ধান (আইআর৮) মাঠ পর্যায়ে চাষাবাদ শুরু হয়। খাটো আকৃতির এ উফশী ধান থেকে প্রতি হেক্টরে ৫-৬ টন (বিঘাপ্রতি ১৮-২১ মণ) ফলন পাওয়া যায়। তখন থেকে উফশী ধান লোকমুখে 'ইরি ধান' নামে পরিচিতি লাভ করে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে মৌসুম ও পরিবেশ উপযোগী উফশী ধানের জাত এবং ধান উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ফসল, মাটি, পানি, সার ইত্যাদি বিষয়ক কলা-কৌশল উদ্ভাবন করছে। বর্তমানে ব্রি উদ্ভাবিত ধানের জাত দেশের মোট ধানি জমির শতকরা প্রায় ৮০ ভাগে চাষাবাদ করা হচ্ছে এবং এ থেকে পাওয়া যাচ্ছে মোট ধান উৎপাদনের প্রায় ৯১ ভাগ। ব্রি ধান এভাবে ইরি ধানের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

আধুনিক ধানের চাষ বইটিতে ব্রি উদ্ভাবিত প্রযুক্তিগুলো আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস বইটি ধান উৎপাদন পদ্ধতি আধুনিকায়নে কৃষক, সম্প্রসারণকর্মী এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিতদের নির্ভরযোগ্য দলিল হিসেবে কাজ করবে।

উফশী ও আধুনিক ধান

যে ধানগাছের সার গ্রহণ ক্ষমতা অধিক এবং ফলন বেশি তাকেই উফশী ধান বলা হয়। উফশী ধান গাছে দু'টি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়, যেমন গাছ মজবুত এবং পাতা খাড়া। আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, ধান পেকে গেলেও গাছ সবুজ থাকে। অপর দিকে স্থানীয় সনাতন জাতের গাছ দুর্বল, পাতা হেলে পড়ে, সার গ্রহণ ক্ষমতা কম এবং ধান পাকার সাথে সাথে গাছ শুকিয়ে যায়। সঙ্গত কারণেই এর ফলন কম হয়।

উফশী ধানে যখন প্রয়োজনীয় বিশেষ গুণ, যেমন রোগবালাই সহনশীলতা, স্বল্প জীবনকাল, খরা, লবণাক্ততা ও জলমগ্নতা সহিষ্ণু ইত্যাদি সংযোজিত হয় তখন তাকে আধুনিক ধান বলা হয়। তাই সকল উফশী ধান আধুনিক নয়, কিন্তু সকল আধুনিক ধানে উফশী গুণ বিদ্যমান।

ব্রি ধানের পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য

ব্রিতে সঙ্করায়ণ ও অন্যান্য আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বনে ধানের জাত উদ্ভাবন করা হয়। এ জাতগুলোর নামকরণে 'বাংলাদেশ রাইস (বিআর)' এবং এর সাথে ক্রমিক নম্বর সংযোজিত করে বিআর১ থেকে বিআর২৬ পর্যন্ত নামকরণ করা হয়। এ নিয়ম ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত চলে আসছিল। এ ছাড়াও জাতগুলোর একটি জনপ্রিয় নামও রাখা হয়েছিল। এরপর জাতীয় বীজ বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী বিআর পরিবর্তন করে 'ব্রি ধান' সংযোজন করে নামকরণের নতুন ধারা চালু হয়। ব্রি ধান২৭ থেকে এ নিয়ম চালু রয়েছে। ব্রি উদ্ভাবিত ধানের বর্তমান জাতের সংখ্যা ৭২টি। এর মধ্যে ৬৮টি ইনব্রিড এবং চারটি হাইব্রিড (সারণী ১)। ইনব্রিড (উফশী) ও হাইব্রিড ধানের অন্যতম পার্থক্য হলো, ইনব্রিড ধান থেকে ফসল কাটার পর বীজ রাখা যায়, কিন্তু হাইব্রিড ধান থেকে বীজ রাখা যায় না।

ব্রি উদ্ভাবিত জাতগুলো আউশ, আমন এবং বোরো মৌসুমে আবাদের জন্য অনুমোদিত। জাতগুলোর কোনটি এক কোনটি দুই বা তিন মৌসুমে আবাদের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। সারণী ১-এ ধানের মৌসুম, উচ্চতা, জীবনকাল, বৈশিষ্ট্য এবং ফলন বর্ণনা করা হয়েছে। সারণী ২-এ জাতভেদে বীজ বপনের সময় এবং পরিবেশ ভিত্তিক চাষ পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। অধিক ফলন নিশ্চিত করতে হলে উন্নত ফসল ব্যবস্থাপনাসহ মৌসুম ভিত্তিক জাত নির্বাচন করতে হবে।

আউশ মৌসুম

এ মৌসুমে বপন এবং রোপণ দু'ভাবেই ধান আবাদ করা যায়। আউশ ধানের বীজ বপনের উপযুক্ত সময় হলো ১৫-৩০ চৈত্র। সারণী ৩-এ আউশের জাতগুলোর চাষ পদ্ধতি ও পরিবেশ উল্লেখ করা হলো। আউশের কোন জাতেই আলোক সংবেদনশীলতা নেই এবং জীবনকালও কম, তাই রোপণের জন্য চারার বয়স হবে ২০-২৫ দিন।

সারণী ১। ব্রি উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল (উফশী) ধানের জাতসমূহের বৈশিষ্ট্য, ১৯৭০-২০১৪।

ধানের জাত	মৌসুম	গড় উচ্চতা (সেমি)	গড় জীবনকাল (দিন)[১]	জাতের বৈশিষ্ট্য	ধানের গড় ফলন (টন/হেক্টর)	অবমুক্তির বছর
বিআর১ (চান্দিনা)	বোরো	৮৮	১৫০	চাল খাটো, মোটা	৫.৫	১৯৭০
	আউশ	৮৮	১২০		৪.০	
বিআর২ (মালা)	বোরো	১২০	১৬০	চাল মাঝারি চিকন ও সাদা	৫.০	১৯৭১
	আউশ	১২০	১২৫		৪.০	
বিআর৩ (বিপ্লব)	বোরো	৯৫	১৭০	চাল মাঝারি মোটা ও	৬.৫	১৯৭৩
	আউশ	১০০	১৩০	পেটে সাদা দাগ আছে	৪.০	
	আমন	১০০	১৪৫		৪.০	
বিআর৪ (ব্রিশাইল)	আমন	১২৫	১৪৫	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা	৫.০	১৯৭৫
বিআর৫ (দুলাভোগ)	আমন	১২০	১৫০	চাল ছোট, গোলাকৃতি ও সুগন্ধি	৩.০	১৯৭৬
বিআর৬	বোরো	১০০	১৪০	চাল লম্বা, চিকন ও সাদা	৪.৫	১৯৭৭
	আউশ	১১৩	১১০		৩.৫	
বিআর৭ (ব্রি বালাম)	বোরো	১২৫	১৫৫	চাল লম্বা, চিকন	৪.৫	১৯৭৭
	আউশ	১২৫	১৩০		৩.৫	
বিআর৮ (আশা)	বোরো	১২৫	১৬০	চাল মাঝারি মোটা ও পেটে	৬.০	১৯৭৮
	আউশ	১২৫	১২৫	দাগ আছে এবং শিলাবৃষ্টি	৫.০	
				এলাকার জন্য উপযোগী		
বিআর৯ (সুফলা)	বোরো	১২৫	১৫৫	চাল লম্বা, মাঝারি মোটা	৬.০	১৯৭৮
	আউশ	১২৫	১২০	ও সাদা এবং শিলাবৃষ্টি	৫.০	
				এলাকার জন্য উপযোগী		
বিআর১০ (প্রগতি)	আমন	১১৫	১৫০	চাল মাঝারি চিকন	৫.৫	১৯৮০
বিআর১১ (মুক্তা)	আমন	১১৫	১৪৫	চাল মাঝারি মোটা	৫.৫	১৯৮০
বিআর১২ (ময়না)	বোরো	১০৫	১৭০	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা	৫.৫	১৯৮৩
	আউশ	১০৫	১৩০		৪.৫	
বিআর১৪ (গাজী)	বোরো	১২০	১৬০	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা	৬.০	১৯৮৩
	আউশ	১২০	১২০		৫.০	
বিআর১৫ (মোহিনী)	বোরো	৯০	১৬৫	চাল মাঝারি চিকন ও সাদা	৫.৫	১৯৮৩
	আউশ	১০০	১২৫		৫.০	
বিআর১৬ (শাহীবালাম)	বোরো	৯০	১৬৫	চাল লম্বা, চিকন ও সাদা	৬.০	১৯৮৩
	আউশ	১১০	১৩০		৫.০	
বিআর১৭ (হাসি)	বোরো	১২৫	১৫৫	চাল মাঝারি মোটা এবং	৬.০	১৯৮৫
				হাওড় অঞ্চলের উপযোগী		
বিআর১৮ (শাহজালাল)	বোরো	১১৫	১৭০	চাল মাঝারি মোটা, সাদা ও	৬.০	১৯৮৫
				হাওড় অঞ্চলের উপযোগী		
বিআর১৯ (মঙ্গল)	বোরো	১১০	১৭০	চাল মাঝারি মোটা এবং	৬.০	১৯৮৫
				হাওড় অঞ্চলের উপযোগী		
বিআর২০ (নিজামী)*	আউশ	১২০	১১৫	চাল মাঝারি মোটা ও স্বচ্ছ	৩.৫	১৯৮৬
				এবং সরাসরি বপনযোগ্য		
বিআর২১ (নিয়ামত)*	আউশ	১০০	১১০	চাল মাঝারি মোটা ও স্বচ্ছ	৩.০	১৯৮৬
				এবং সরাসরি বপনযোগ্য		
বিআর২২ (কিরণ)**	আমন	১২৫	১৫০	চাল খাটো, মোটা ও সাদা	৫.০	১৯৮৮
				এবং নাবী জাত		

সারণী ১। ক্রমশ।

ধানের জাত	মৌসুম	গড় উচ্চতা (সেমি)	গড় জীবনকাল (দিন)[১]	জাতের বৈশিষ্ট্য	ধানের গড় ফলন (টন/হেক্টর)	অবমুক্তির বছর
বিআর২৩ (দিশারী)**	আমন	১২০	১৫০	চাল লম্বা, চিকন ও সাদা এবং নাবি জাত	৫.৫	১৯৮৮
বিআর২৪ (রহমত)*	আউশ	১০৫	১০৫	চাল লম্বা, চিকন ও সাদা এবং সরাসরি বপনযোগ্য	৩.৫	১৯৯২
বিআর২৫ (নয়াপাজাম)	আমন	১৩৮	১৩৫	চাল খাটো, মোটা ও সাদা	৪.৫	১৯৯২
বিআর২৬ (শ্রাবণী)	আউশ	১১৫	১১৫	চাল চিকন, লম্বা ও সাদা এবং এ্যামাইলোজ কম	৪.০	১৯৯৩
ব্রি ধান২৭	আউশ	১৪০	১১৫	চাল মাঝারি মোটা এবং বরিশাল অঞ্চলের উপযোগী	৪.০	১৯৯৪
ব্রি ধান২৮	বোরো	৯০	১৪০	চাল মাঝারি চিকন ও সাদা	৬.০	১৯৯৪
ব্রি ধান২৯	বোরো	৯৫	১৬০	চাল মাঝারি চিকন ও সাদা	৭.৫	১৯৯৪
ব্রি ধান৩০	আমন	১২০	১৪৫	চাল মাঝারি চিকন ও সাদা	৫.০	১৯৯৪
ব্রি ধান৩১	আমন	১১৫	১৪০	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা	৫.০	১৯৯৪
ব্রি ধান৩২	আমন	১২০	১৩০	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা	৫.০	১৯৯৪
ব্রি ধান৩৩	আমন	১০০	১১৮	চাল খাটো, মোটা, পেটে সাদা দাগ আছে এবং আগাম জাত	৪.৫	১৯৯৭
ব্রি ধান৩৪	আমন	১১৭	১৩৫	চাল খাটো, মোটা ও সুগন্ধি	৩.৫	১৯৯৭
ব্রি ধান৩৫	বোরো	১০৫	১৫৫	চাল খাটো, মোটা এবং বাদামি গাছফড়িং প্রতিরোধী	৫.০	১৯৯৮
ব্রি ধান৩৬	বোরো	৯০	১৪০	চাল লম্বা, চিকন এবং ঠাণ্ডা সহিষ্ণু	৫.০	১৯৯৮
ব্রি ধান৩৭	আমন	১২৫	১৪০	চাল মাঝারি চিকন ও সুগন্ধি	৩.৫	১৯৯৮
ব্রি ধান৩৮	আমন	১২৫	১৪০	চাল লম্বা, চিকন ও সুগন্ধি	৩.৫	১৯৯৮
ব্রি ধান৩৯	আমন	১০৬	১২২	চাল লম্বা ও চিকন	৪.৫	১৯৯৯
ব্রি ধান৪০	আমন	১১০	১৪৫	চাল মাঝারি মোটা, জীবনকালের শেষ পর্যায়ে মাঝারি মাত্রার লবণাক্ততা সহনশীল	৪.৫	২০০৩
ব্রি ধান৪১	আমন	১১৫	১৪৮	চাল লম্বাটে মোটা, জীবনকালের শেষ পর্যায়ে মাঝারি মাত্রার লবণাক্ততা সহনশীল	৪.৫	২০০৩
ব্রি ধান৪২***	আউশ	১০০	১০০	চাল মাঝারি, সাদা ও খরা সহিষ্ণু	৩.৫	২০০৪
ব্রি ধান৪৩***	আউশ	১০০	১০০	চাল মাঝারি, সাদা এবং খরা সহিষ্ণু	৩.৫	২০০৪
ব্রি ধান৪৪	আমন	১৩০	১৪৫	চাল মোটা ও উপকূলীয় অলবণাক্ত জোয়ার-ভাটা অঞ্চলের উপযোগী	৫.৫	২০০৫
ব্রি ধান৪৫	বোরো	১০০	১৪০	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা	৬.৫	২০০৫
ব্রি ধান৪৬**	আমন	১০৫	১৫০	চাল মাঝারি মোটা, নাবি জাত ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রোপণযোগ্য	৪.৭	২০০৭
ব্রি ধান৪৭	বোরো	১০৫	১৫২	চাল মাঝারি মোটা এবং সম্পূর্ণ জীবনকালে ৬ ডিএস/মিটার লবণাক্ততা সহনশীল	৬.০	২০০৭
ব্রি ধান৪৮	আউশ	১০৫	১১০	চাল মাঝারি মোটা, ভাত ঝরঝরে	৫.৫	২০০৮
ব্রি ধান৪৯	আমন	১০০	১৩৫	চাল মাঝারি চিকন, নাইজার-শাইলের মতো এবং বিআর১১ থেকে ৭ দিন আগাম	৫.৫	২০০৮

সারণী ১। ক্রমশ।

ধানের জাত	মৌসুম	গড় উচ্চতা (সেমি)	গড় জীবনকাল (দিন)[1]	জাতের বৈশিষ্ট্য	ধানের গড় ফলন (টন/হেক্টর)	অবমুক্তির বছর
ব্রি ধান৫০ (বাংলামতি)	বোরো	৮২	১৫৫	চাল লম্বা, চিকন, সুগন্ধি ও সাদা	৬.০	২০০৮
ব্রি ধান৫১	আমন	৯০	১৪২ (জলমগ্ন না হলে) ১৫৭ (১৪ দিন জলমগ্ন থাকলে)	চাল মাঝারি চিকন, স্বচ্ছ ও সাদা এবং জলমগ্ন সহনশীল	৪.৫	২০১০
ব্রি ধান৫২	আমন	১১৬	১৪০ (জলমগ্ন না হলে) ১৫৫ (১৪ দিন জলমগ্ন থাকলে)	চাল মাঝারি মোটা ও জলমগ্ন সহনশীল	৫.০	২০১০
ব্রি ধান৫৩	আমন	১০৫	১২৫	চাল মাঝারি চিকন, জীবনকালের শেষ পর্যায়ে মাঝারি মাত্রার লবণাক্ততা সহনশীল	৪.৫	২০১০
ব্রি ধান৫৪	আমন	১১৫	১৩৫	চাল মাঝারি চিকন, জীবনকালের শেষ পর্যায়ে মাঝারি মাত্রার লবণাক্ততা সহনশীল	৪.৫	২০১০
ব্রি ধান৫৫	বোরো আউশ	১০০ ১০০	১৪৫ ১০৫	চাল মাঝারি চিকন ও লম্বা, মধ্যম মানের লবণ, খরা ও ঠাণ্ডা সহনশীল	৭.০ ৫.০	২০১১
ব্রি ধান৫৬	আমন	১১৫	১১০	চাল লম্বা, মোটা ও রঙ সাদা এবং খরা সহনশীল, প্রজনন পর্যায়ে ১৪-২১ দিন বৃষ্টি না হলেও ফলনের তেমন কোন ক্ষতি হয় না	৪.৫	২০১১
ব্রি ধান৫৭	আমন	১১৫	১০৫	লম্বা, সরু চাল এবং খরা পরিহারকারী, প্রজনন পর্যায়ে ১০-১৪ দিন বৃষ্টি না হলেও ফলনের তেমন কোন ক্ষতি হয় না	৪.০	২০১১
ব্রি ধান৫৮	বোরো	১০০	১৫৫	দানা অনেকটা ব্রি ধান২৯ এর মতো, তবে সামান্য চিকন	৭.২	২০১২
ব্রি ধান৫৯	বোরো	৮৩	১৫৩	চাল মাঝারি মোটা এবং সাদা, ডিগপাতা খাড়া ও গাঢ় সবুজ এবং হেলে পড়ে না	৭.১	২০১৩
ব্রি ধান৬০	বোরো	৯৮	১৫১	চাল লম্বা ও সরু এবং সাদা	৭.৩	২০১৩
ব্রি ধান৬১	বোরো	৯৬	১৫০	চাল মাঝারি সরু, সাদা এবং লবণাক্ততা সহনশীল	৬.৩	২০১৩
ব্রি ধান৬২	আমন	১০২	১০০	চাল লম্বা, সরু এবং সাদা, মধ্যম মাত্রার জিঙ্ক সমৃদ্ধ এবং আগামজাত	৪.৫	২০১৩
ব্রি ধান৬৩	বোরো	৮৬	১৪৮	চাল বাসমতির মত চিকন ও লম্বা, অধিক ফলনশীল সরু বালাম ধানের জাত	৭.০	২০১৪
ব্রি ধান৬৪	বোরো	১১০	১৫২	চাল মাঝারি মোটা, সাদা এবং জিঙ্ক সমৃদ্ধ (২৪ মিলিগ্রাম/কেজি)	৬.৫	২০১৪
ব্রি ধান ৬৫	আউশ	৮৮	৯৯	চাল মাঝারি চিকন, সাদা, ডিগপাতা খাড়া এবং গাছ ছোট হওয়ায় সহজে হেলে পড়ে না ও খরা সহিষ্ণু	৩.৫	২০১৪

সারণী ১। ক্রমশ।

ধানের জাত	মৌসুম	গড় উচ্চতা (সেমি)	গড় জীবনকাল (দিন)[১]	জাতের বৈশিষ্ট্য	ধানের গড় ফলন (টন/হেক্টর)	অবমুক্তির বছর
ব্রি ধান৬৬	আমন	১২০	১১৩	চাল মাঝারি লম্বা ও মোটা, সাদা, প্রজনন পর্যায়ে খরা সহনশীল, উচ্চমাত্রার প্রোটিন সমৃদ্ধ	৪.৫	২০১৪
ব্রি ধান৬৭	বোরো	১০০	১৪৩	চাল মাঝারি চিকন, সাদা এবং সম্পূর্ণ জীবনকালে ৮ ডিএস/মিটার মাত্রার লবণাক্ততা সহনশীল	৬.০	২০১৪
ব্রি ধান৬৮	বোরো	৯৭	১৪৯	চাল মাঝারি মোটা, সাদা, ধান পাকার সময় ডিগ পাতা সবুজ থাকে	৭.৩	২০১৪
ব্রি ধান৬৯	বোরো	১০৫	১৫৩	চাল মাঝারি মোটা, সাদা, ডিগপাতা খাড়া প্রশস্ত ও লম্বা এবং উপকরণ সাশ্রয়ী জাত	৭.৩	২০১৪
ব্রি হাইব্রিড ধান১	বোরো	১১০	১৫৫	চাল মাঝারি চিকন স্বচ্ছ ও সাদা	৮.৫	২০০১
ব্রি হাইব্রিড ধান২	বোরো	১০৫	১৪৫	চাল মাঝারি মোটা এবং আগাম	৮.০	২০০৮
ব্রি হাইব্রিড ধান৩	বোরো	১১০	১৪৫	চাল মাঝারি মোটা এবং আগাম	৯.০	২০০৯
ব্রি হাইব্রিড ধান৪	আমন	১১২	১১৮	চাল মাঝারি চিকন, স্বচ্ছ ও সাদা	৬.৫	২০১০

[১]জীবনকাল বপনের সময়ের উপর নির্ভর করে কম-বেশি হয়। *বিআর২০, বিআর২১ ও বিআর২৪ বৃষ্টিবহুল এলাকার উপযোগী। **আলোক-সংবেদনশীল। ***ব্রি ধান৪২ এবং ব্রি ধান৪৩ বৃষ্টিবহুল এবং খরা-প্রবণ উভয় অঞ্চলের উপযোগী।

আমন মৌসুম

রোপা আমনের জাতগুলোর কোনটা আলোক-সংবেদনশীল, কোনটা স্বল্প আলোক-সংবেদনশীল আবার কোনটাতে আলোক সংবেদনশীলতা নেই। এ বৈশিষ্ট্যের জন্য জাতভেদে বীজ বপন এবং রোপণ স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে আগানো বা পিছানো যায়। রোপা আমনের জাতগুলো ১৫ আষাঢ় থেকে ১৫ শ্রাবণ পর্যন্ত বীজ বপন করে ২৫-৩০ দিনের চারা ১৫ শ্রাবণ থেকে ১৫ ভাদ্র পর্যন্ত রোপণ করা যাবে। দেখা গেছে, ১৫-৩০ আষাঢ়ে বীজ বপন করে ১৫-৩০ শ্রাবণের মধ্যে চারা রোপণ করলে ফলন সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়।

বোরো মৌসুম

বোরো মৌসুমের জাতগুলোতে কোন আলোক সংবেদনশীলতা নেই। এ মৌসুম শুরু হয় ঠাণ্ডা ও ছোট দিন দিয়ে, আর ফুল ফোটে গরমের শুরুতে এবং বড় দিনে। তাই আলোক-সংবেদনশীল কোন ধানের জাত বোরো মৌসুমে আবাদ করা উচিত নয়। বোরো মৌসুমের যে সমস্ত জাতের জীবনকাল ১৫০ দিন বা তার চেয়ে কম সেগুলোর বীজ বপন করতে হবে অগ্রহায়ণ মাসের শুরুতে এবং যে জাতগুলোর জীবনকাল ১৫০ দিনের বেশি সেগুলো ১৫ কার্তিক থেকে বীজ বপন করা যাবে। এ সময়ে বীজ বপন করলে চারার উচ্চতা ভেদে ৩৫ থেকে ৪৫ দিনের চারা রোপণ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। বোরো ধানের রোপণ ১৫ মাঘের মধ্যে শেষ করা উচিত। এরপর রোপণ করলে জীবনকাল ও ফলন উভয়ই কমে যায়। সারণী ৪-এ পরিবেশভেদে জাত নির্বাচনের কিছু পরামর্শ দেয়া হলো। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত এলাকায় ১-১৫ নভেম্বরের মধ্যে বীজতলায় চারা বপন করে ৩৫-৪০ দিনের চারা রোপণ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

সারণী ২। রোপা আমনের জাতগুলোর আলোক সংবেদনশীলতা ও জাত নির্বাচনের কৌশল।

জাত	বিশেষ গুণ	সুপারিশ
বিআর৫ ব্রি ধান৩৪ ব্রি ধান৩৭ ব্রি ধান৩৮	সুগন্ধি পোলাও/ বিরিয়ানির চাল	এ জাতগুলো আলোক-সংবেদনশীল এবং কাণ্ড উফশী ধানের মতো পুরোপুরি মজবুত নয়। এজন্য এ জাতগুলোর বীজ বপন করতে হবে ৫-১০ শ্রাবণের মধ্যে। এরপর ২৫-৩০ দিনের চারা অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে রোপণ করতে হবে। এতে ফসলের জীবনকাল কমার সাথে সাথে গাছের উচ্চতাও কম হবে যার প্রভাবে কাণ্ডের মজবুতি বাড়বে এবং ঢলে পড়া প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ফসল খরায় না পড়ার জন্য সম্পূরক সেচের ব্যবস্থা করলে হেক্টর প্রতি ৩.৫-৪.০ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া যেতে পারে।
বিআর১০ বিআর১১ ব্রি ধান৩০ ব্রি ধান৩১	অধিক ফলনশীল মাঝারি মোটা থেকে মোটা চাল	এ জাতগুলো স্বল্প আলোক-সংবেদনশীল এবং সবচেয়ে বেশি ফলনশীল। এ জাতগুলো ১৫-২০ আষাঢ়ে বীজ বপন করে ২৫-৩০ দিনের চারা স্বাভাবিক জমিতে রোপণ করলে হেক্টর প্রতি ফলন দেয় ৫.০-৬.০ টন। এ ধান পাকে ৬ অগ্রহায়ণের পর। ফলে ডাল, তেল ও গম ফসলের আবাদ ব্যাহত হয়। যেহেতু এ জাতগুলো স্বল্প আলোক-সংবেদনশীল, তাই এগুলোর বীজ বপন যদি ১৫-২০ জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত এগিয়ে এনে ২৫-৩০ দিনের চারা রোপণ করা যায় তাহলে ফসল পাকে ১০-১৫ কার্তিকের মধ্যে। ফলে ডাল, তেল, গম ফসল উপযুক্ত সময়ে বপন করা যায় এবং ধানের ফলনের তেমন কোন তারতম্য হয় না। এভাবে আগে বীজ বপন করলে রোপণের সময় খরা কবলিত হলে চারার বয়স স্বাভাবিকের চেয়ে ১৫-২০ দিন পর্যন্ত বাড়ানো যায়, অর্থাৎ ৪০-৪৫ দিনের চারা রোপণ করা যায়। আবার টার্মিনাল খরা, অর্থাৎ কার্তিকের প্রথম থেকে খরা হলে আগাম বপনের জন্য ফলনের ওপর তেমন প্রভাব পড়ে না, কারণ তখন চাল শক্ত পর্যায়ে চলে যায়। অপরদিকে স্থানীয় শাইল ধানে তখন থোড় আসা শুরু হয় এবং খরা কবলিত হয়ে পড়ে। স্বল্প আলোক সংবেদনশীলতা থাকার কারণে জাতগুলোর ফসল আগে পাকে এবং ফলনও স্থানীয় জাতের চেয়ে অনেক বেশি হয়।
বিআর২৫ ব্রি ধান৩২ ব্রি ধান৩৩ ব্রি ধান৩৯ ব্রি ধান৪৯	আগাম জাত	এ জাতগুলোতে আলোক সংবেদনশীলতা নেই। ফলে এ জাতগুলো ১৫ আষাঢ় থেকে ১৫ শ্রাবণ পর্যন্ত বপন এবং ২৫-৩০ দিনের চারা ১৫ শ্রাবণ থেকে ১৫ ভাদ্র পর্যন্ত রোপণ করা যায়। **এ জাতগুলোর বীজ কোন ক্রমেই আষাঢ় মাসের ৫ তারিখের আগে বপন করা উচিত নয়। ব্রি ধান৩৩ এর বীজ ৫ আষাঢ়ে বপন করে ২৫-৩০ দিনের চারা রোপণ করলে আশ্বিনের শেষ সপ্তাহে ফসল কাটা** যাবে। এভাবে ব্রি ধান৩৯ পাকবে কার্তিকের প্রথম সপ্তাহে। বিআর২৫, ব্রি ধান৩২ এবং ব্রি ধান৪৯ পাকবে কার্তিকের মাঝামাঝি। আলোক সংবেদন-শীলতা না থাকায় এ জাতগুলো কৃষক তার ইচ্ছেমত যেদিন ফসল কাটতে চান সেদিনই তা পারেন। এজন্য যে জাতের জীবনকাল যত দিন, ফসল কাটার দিন থেকে ততদিন আগে বীজ বপন করে ২৫-৩০ দিনের চারা রোপণ করে ঠিকভাবে ফসল পরিচর্যা করতে হবে। ব্রি ধান৪৯ এর চাল নাইজারশাইলের মতো। এ জাতের জীবনকাল বিআর১১ এর চেয়ে ৭ দিন আগাম। এসব জাতের ধান কাটার পর সহজে রবিশস্য আবাদ করা যায়।
ব্রি হাইব্রিড ধান৪	বন্যামুক্ত এলাকার জাত	বন্যামুক্ত এলাকার রোপা আমন চাষের অনুকূল পরিবেশে চাষাবাদের জন্য ব্রি হাইব্রিড ধান৪ নির্বাচন করা যেতে পারে।
ব্রি ধান৫১ ব্রি ধান৫২	জলমগ্নতা সহিষ্ণু জাত	এ জাত দুটি স্বল্প আলোক-সংবেদনশীল এবং ১০ থেকে ১৫ দিন আকস্মিক বন্যায় জলমগ্ন থাকার পরও প্রচলিত স্বর্ণা এবং বিআর১১ ধানের চেয়ে ফলন বেশি দেয়। এজন্য বাংলাদেশের যে সমস্ত এলাকায় আকস্মিক বন্যার আশঙ্কা থাকে সেখানে প্রত্যাশিত ফলন পেতে এ জাতগুলো নির্বাচন করতে হবে। জাতগুলোর বীজ ১৫-২০ আষাঢ়ে বপন করে ২৫-৩০ দিনের চারা রোপণ করতে হবে এবং এদের চাষাবাদ বিআর১১ এর অনুরূপ।

সারণী ২ । ক্রমশ।

জাত	বিশেষ গুণ	সুপারিশ
বিআর২২ বিআর২৩ ব্রি ধান৪৬	মাঝারি মোটা থেকে লম্বা মোটা চাল এবং নাবি জাত	এ জাতগুলো আলোক–সংবেদনশীল। নাবি গুণ থাকার জন্য এদের বীজ ২০–৩০ শ্রাবণে বপন করে ৩০–৪০ দিনের চারা সর্বশেষ ৩১ ভাদ্র পর্যন্ত রোপণ করা যাবে। অর্থাৎ আউশ ও পাট কাটা জমি অথবা বন্যা প্রবণ এলাকা যেখানে ১৫ ভাদ্রের পর রোপণের উপযোগী সেখানেই এ জাতগুলো আবাদ করা যাবে। মনে রাখতে হবে যে, রোপা আমন মৌসুমে ভাদ্র মাসের পর কোন ধান রোপণ করা যাবে না।
ব্রি ধান৪০ ব্রি ধান৪১ ব্রি ধান৫৩ ব্রি ধান৫৪	মাঝারি মাত্রার লবণাক্ততা সহনশীল	ব্রি ধান৫৩ ছাড়া বাকি জাতগুলো আলোক–সংবেদনশীল। সমুদ্র উপকূলীয় লবণাক্ত পরিবেশের জন্য এ জাতগুলো সুপারিশ করা হয়েছে। ৩৫–৪০ দিনের চারা রোপণ করতে হবে। তবে ব্রি ধান৫৩ আলোক–সংবেদনশীল নয় বলে আষাঢ়ের দ্বিতীয় সপ্তাহে বীজ বপন করতে হবে। সে ক্ষেত্রে চারার বয়স হবে ৩০-৩৫ দিন। ব্রি ধান৫৩, ব্রি ধান৪০ ও ব্রি ধান৪১ থেকে প্রায় ২০ দিন আগাম হওয়ায় এ ধান কাটার পর গম ও স্বল্প জীবনকালের সরিষা আবাদ করা যায়।
ব্রি ধান৪৪	মোটা চাল এবং জোয়ার–ভাটা পরিবেশের ধান	জাতটি আলোক–সংবেদনশীল। জোয়ার–ভাটা এলাকায় রোপণের জন্য চারা যত বড় হবে ততই ভাল। তাই এর বীজ বপন ২০–২৫ জ্যৈষ্ঠ হলে রোপণের জন্য চারার বয়স ৪০-৫০ দিন হতে পারে। তখন চারার উচ্চতা ও জমিতে জোয়ারের গভীরতা পর্যবেক্ষণ করে ওসব এলাকায় রোপণ করতে হবে।
ব্রি ধান৫৬ ব্রি ধান৫৭ ব্রি ধান৬৬	খরা সহনশীল জাত	এ জাতগুলো স্বল্প আলোক-সংবেদনশীল। এগুলো আমন মৌসুম ব্যতীত আউশ বা বোরো মৌসুমে আবাদ করা ঠিক হবে না। ব্রি ধান৫৬ এর জীবনকাল বিনাধান–৭ এর চেয়ে ৫ দিন এবং ব্রি ধান৩৩ এর চেয়ে ১০ দিন আগাম। ব্রি ধান৫৬ খরা সহনশীল জাত। প্রজনন পর্যায়ে সর্বোচ্চ ১৪–২১ দিন বৃষ্টি না হলেও ফলনের তেমন কোন ক্ষতি হয় না এবং হেক্টরে প্রায় ৩.৫ টন ফলন দিতে সক্ষম। স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হলে হেক্টর প্রতি ৪.৫ টন ফলন দিতে পারে। ব্রি ধান৫৭ এর জীবনকাল আগাম উফশী জাত বিনাধান–৭ এর চেয়ে ১০ দিন এবং ব্রি ধান৩৩ এর চেয়ে ১৫ দিন কম এবং চাল চিকন। ব্রি ধান৫৭ মধ্যম মাত্রার খরা সহনশীল। এ জাতের জীবনকাল স্বল্প মেয়াদি হওয়ায় খরা দেখা দেয়ার পূর্বেই দানা দুধ অবস্থা থেকে আধা শক্ত অবস্থায় চলে আসে। তাই একে খরা পরিহারকারী জাত হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রজনন পর্যায়ে একটানা সর্বোচ্চ ১০–১৪ দিন বৃষ্টি না হলেও ফলনের তেমন কোন ক্ষতি হয় না এবং হেক্টরে প্রায় ৪.০ টন ফলন দিতে সক্ষম। ব্রি ধান৬৬ এর জীবনকাল ১১০–১১৩ দিন। প্রজনন পর্যায়ে সর্বোচ্চ ১৪–২১ দিন বৃষ্টি না হলেও ফলনের তেমন কোন ক্ষতি হয় না এবং হেক্টরে প্রায় ৪.৫ টন ফলন দিতে সক্ষম।
ব্রি ধান৬২	সবচেয়ে আগাম জাত, চাল উচ্চ মাত্রার প্রোটিন ও মধ্যম মাত্রার জিঙ্ক সমৃদ্ধ	এ জাতে আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। জীবনকাল ১০০ দিন যা ব্রি ধান৩৩ এর চেয়ে ১০–১২ দিন আগাম। ডিগপাতা খাড়া ও গাঢ় সবুজ রঙের এবং গাছ সহজে হেলে পড়ে না। আষাঢ়ের ১৫–২০ তারিখের মধ্যে বীজ বপন করে ২০–২৫ দিনের চারা রোপণ করলে আশ্বিনের শেষ সপ্তাহে ধান কেটে আগাম আলু বা রবিশস্য চাষ করা যায়।

সারণী ৩। বোনা এবং রোপা আউশের জাত এবং চাষাবাদের পরিবেশ।

চাষ পদ্ধতি	জাত	পরামর্শ
বোনা আউশ	বিআর২১, বিআর২৪ এবং ব্রি ধান২৭	বৃষ্টিবহুল এলাকার উপযোগী।
	ব্রি ধান৪২, ব্রি ধান৪৩ এবং ব্রি ধান৬৫	খরা-প্রবণ এবং বৃষ্টিবহুল উভয় এলাকার উপযোগী।
রোপা আউশ	বিআর২৬, ব্রি ধান২৭, ব্রি ধান৪৮, ব্রি ধান৫৫	সাধারণ রোপা আউশ এলাকা অপেক্ষাকৃত নিচু জমিতে চাষের যোগ্য।

সারণী ৪। বোরো ধানের বৈশিষ্ট্য ও জাত নির্বাচন।

জাতের নাম	বৈশিষ্ট্য	পরামর্শ
বিআর১, বিআর৬, ব্রি ধান২৮, ব্রি ধান৪৫ এবং ব্রি ধান৫৫	জীবনকাল ১৪৫-১৫০ দিন (আগাম জাত)	সেচের পানি ঘাটতি এলাকার জন্য আগাম জাত হিসেবে এ জাতগুলো নির্বাচন করা যেতে পারে।
বিআর১৪, বিআর১৬, ব্রি ধান২৯, ব্রি ধান৫৯, ব্রি ধান৬০ এবং ব্রি হাইব্রিড ধান১	জীবনকাল ১৫০ দিনের বেশি (দীর্ঘ মেয়াদী)	উর্বর জমি ও পানি ঘাটতি নেই এমন এলাকার জন্য অধিক ফলনশীল জাত হিসেবে এগুলো চাষ করা যেতে পারে।
ব্রি হাইব্রিড ধান২ এবং ব্রি হাইব্রিড ধান৩	জীবনকাল ১৪৫ দিন (আগাম জাত)	এ জাতগুলো ব্রি ধান২৮ এর পরিপূরক হিসেবে চাষাবাদ করা যায়।
ব্রি ধান৩৬	ঠাণ্ডা সহিষ্ণু ও আগাম জাত	অধিক ঠাণ্ডার সময় চারা কম মারা যায়।
বিআর১৭, বিআর১৮ এবং বিআর১৯	কাণ্ড উঁচু বলে ফসল পাকার সময় ছোট-খাটো আগাম ঢলে ধান তলিয়ে যায় না।	হাওড় এলাকার উপযোগী জাত।
বিআর৮ এবং বিআর৯ বিআর১৪	শিষের সাথে ধান মজবুতির সঙ্গে সংযুক্ত	শিলাবৃষ্টি-প্রবণ এলাকার উপযোগী জাত।
ব্রি ধান৪৭, ব্রি ধান৬১ এবং ব্রি ধান৬৭	লবণাক্ততা সহনশীল জাত। ব্রি ধান৪৭ এবং ব্রি ধান৬৭ সম্পূর্ণ জীবনকালে মাঝারি (৬-৮ ডিএস/মিটার) মাত্রায় লবণাক্ততা সহনশীল। ব্রি ধান৪৭ ধানের চাল মাঝারি মোটা এবং ব্রি ধান৬৭ ধানের চাল মাঝারি চিকন ও সাদা, ভাত ঝরঝরে হয় এবং দীর্ঘ সময় রাখলেও নষ্ট হয় না। ব্রি ধান৬১ এর চাল মোটা ও সাদা এবং শিষ থেকে ধান সহজে ঝরে পড়ে না। এ জাতগুলোর ধানগাছের কাণ্ড বেশ শক্ত এবং সহজে হেলে পড়ে না। ব্রি ধান৬৭ এর জীবনকাল ১৪০-১৪৫ দিন এবং লবণাক্ততার মাত্রাভেদে হেক্টর প্রতি ৩.৮-৭.৪ টন	ব্রি ধান৪৭ এর ক্ষেত্রে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ ধান পাকলেই কাটতে হবে অধিক পরিপক্ক হলে শিষ থেকে কিছু ধান ঝরে যেতে পারে, কিন্তু ব্রি ধান৬১ এর ধান সহজে শিষ থেকে ঝরে পড়ে না। সেচের পানির লবণাক্ততা ১ ডিএস/মিটার এর মধ্যে থাকে এবং ভূগর্ভস্থ অথবা নদীর পানি এবং মাটির লবণাক্ততা ১০-১২ ডিএস/মিটার হয় সেখানে এ ধানের চাষ করা যায়। দুই বা তিন সেচ পর পর অবশিষ্ট পানি নিষ্কাশন করতে হবে এবং নতুন পানি দিয়ে সেচ দিতে হবে। যদি সেচের পানির লবণাক্ততা ৩ ডিএস/মিটার বা তার কম হয় তাহলে সেচের পানি (ভূগর্ভস্থ অথবা নদীর পানি) ব্যবহার করে যেখানে মাটির লবণাক্ততা ৫-৬ ডিএস/মিটার আছে সেখানে সহজেই এ ধানের চাষ করা যায়। ৩ ডিএস/মিটার এর চেয়ে বেশি মাত্রার লবণাক্ততা যুক্ত পানি কখনও সেচের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। এতে মাটির লবণাক্ততা দিন দিন বৃদ্ধি পায়।

সারণী ৪ । ক্রমশ ।

জাতের নাম	বৈশিষ্ট্য	পরামর্শ
ব্রি ধান৪৭, ব্রি ধান৬১ এবং ব্রি ধান৬৭	পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায় । এর দানা দেখতে ব্রি ধান২৮ এর মত এবং শিষ থেকে সহজে ধান ঝরে পড়ে না ।	
ব্রি ধান৫০ (বাংলামতি) এবং ব্রি ধান৬৩	ব্রি ধান৫০ জাতের চালে সুগন্ধ আছে । ধান ও চাল দুটোই সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে । এ জাত বাসমতির মতো চিকন, লম্বা ও জনপ্রিয় এবং রপ্তানি-যোগ্য । ব্রি ধান৬৩ জাতটির চাল সরু এবং গুণাগুণ বালাম চালের মত এজন্য জাতটি সরু বালাম নামে পরিচিত ।	যেসব এলাকায় রাবার হলারে ধান ভাঙ্গানো সম্ভব নয় সেসব এলাকায় ধান সিদ্ধ করে সাধারণ মেশিনে ধান ভাঙ্গানো যায়, এতে চাল ভাঙ্গে না
ব্রি ধান৫৫	মৃদু মানের লবণাক্ততা, খরা এবং ঠাণ্ডা সহনশীল	এ ধানের জাত বোরো মৌসুমে ব্রি ধান২৮ থেকে ৫ দিন নাবি এবং হেক্টর প্রতি প্রায় ১ টন ফলন বেশি দেয় । এ ধানের চাল লম্বা সরু এবং ভাত কিছুটা আঠালো হয়, তবে সুস্বাদু । দু'বার সিদ্ধ চালের ভাত আঠালো হয় না ।
ব্রি ধান৫৮, ব্রি ধান৬৮ এবং ব্রি ধান৬৯	ব্রি ধান৫৮ এর জীবনকাল ব্রি ধান২৮ এর চেয়ে ৬-৭ দিন নাবি কিন্তু ব্রি ধান২৯ এর চেয়ে ৭-৮ দিন আগাম । ব্রি ধান৬৮ এর জীবনকাল ব্রি ধান২৮ এর চেয়ে ৪-৫ দিন নাবি । ব্রি ধান৬৯ এর জীবনকাল ব্রি ধান২৮ এর ৮-১০ দিন নাবি ।	উর্বর জমি ও পানি ঘাটতি নেই এমন এলাকার জন্য অধিক ফলনশীল জাত হিসেবে এর চাষ করা যেতে পারে । উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে ব্রি ধান৬৮ এবং ব্রি ধান৬৯ হেক্টর প্রতি ৯ টন পর্যন্ত ফলন দিতে পারে । অন্যান্য উফশী জাতের চেয়ে ব্রি ধান৬৯ জাতটি চাষ করলে ২০% সার কম লাগে ।
ব্রি ধান৬৪	ব্রি ধান৬৪ বোরো মৌসুমের একটি জিঙ্ক সমৃদ্ধ ধানের জাত । এ জাতের গড় জীবনকাল ১৫২ দিন ।	এ জাতের প্রতি কেজি চালে ২৪ মিলি গ্রাম জিঙ্ক রয়েছে ।

ধান চাষের উন্নত পদ্ধতি

উপযুক্ত চাষাবাদ পদ্ধতি সঠিকভাবে অনুসরণ করলে উফশী ধানের ফলন বেড়ে যায় । নিচে ধান চাষের উন্নত পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করা হলো ।

বীজ বাছাই

বপনের জন্য পুষ্ট ও সুস্থ বীজ নিশ্চিত করতে হবে । কারণ ভাল বীজ মানে সবল চারা । এজন্য বীজ বাছাইয়ের নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে ।

দশ লিটার পরিষ্কার পানিতে ৩৭৫ গ্রাম ইউরিয়া সার মেশান। এবার ১০ কেজি বীজ ছেড়ে হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে দিন। পুষ্ট বীজ ডুবে নিচে জমা হবে এবং অপুষ্ট, হালকা বীজ ভেসে উঠবে। হাত অথবা চালনি দিয়ে ভাসমান বীজগুলো সরিয়ে ফেলুন। ভারী বীজ নিচ থেকে তুলে নিয়ে পরিষ্কার পানিতে ৩-৪ বার ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে। ইউরিয়া মিশানো পানি সার হিসেবে বীজতলায় ব্যবহার করা যায়।

বীজ শোধন ও জাগ দেয়া

বাছাইকৃত বীজ দাগমুক্ত ও পরিপুষ্ট হলে সাধারণভাবে শোধন না করলেও চলে। তবে শোধনের জন্য ৫২-৫৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস (হাতে সহনীয়) তাপমাত্রার গরম পানিতে ১৫ মিনিট বীজ ডুবিয়ে রাখলে জীবাণুমুক্ত হয়। বীজ যদি দাগযুক্ত হয় এবং বাকানি আক্রমণের আশঙ্কা থাকে তাহলে কারবেনডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক দিয়ে বীজ শোধন করতে হবে।

তিন গ্রাম ছত্রাকনাশক এক লিটার পানিতে ভালভাবে মিশিয়ে এক কেজি পরিমাণ বীজ পানিতে ডুবিয়ে নাড়াচাড়া করে ১২ ঘণ্টা রেখে দিতে হবে। এরপর বীজ পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে। এভাবে শোধনকৃত বীজ বাঁশের টুকরি বা চটের বস্তায় ভরে খড়/বস্তা দিয়ে চাপা দিয়ে রাখুন। এভাবে জাগ দিলে আউশ ও আমন মৌসুমের জন্য ৪৮ ঘণ্টা বা দুই দিনে, বোরো মৌসুমে ৭২ ঘণ্টা বা তিন দিনে ভাল বীজের অঙ্কুর বের হবে এবং বীজতলায় বপনের উপযুক্ত হবে।

বীজতলা তৈরি

দোঁআশ ও এঁটেল মাটি বীজতলার জন্য ভাল। বীজতলার জমি উর্বর হওয়া প্রয়োজন। যদি জমি অনুর্বর হয় তাহলে প্রতি বর্গমিটার জমিতে দুই কেজি হারে জৈব সার (পচা গোবর বা আবর্জনা) সুন্দরভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। এরপর জমিতে ৫-৬ সেন্টিমিটার পানি দিয়ে দু'তিনটি চাষ ও মই দিয়ে ৭-১০ দিন রেখে দিতে হবে এবং পানি ভালভাবে আটকিয়ে রাখতে হবে। আগাছা, খড় ইত্যাদি পচে গেলে আবার চাষ ও মই দিয়ে কাদা করে জমি তৈরি করতে হবে। এবার জমির দৈর্ঘ্য বরাবর এক মিটার চওড়া বেড তৈরি করতে হবে (চিত্র ১)। দু'বেডের মাঝে ২৫-৩০ সেন্টিমিটার জায়গা ফাঁকা রাখতে হবে। নির্ধারিত জমির দু'পাশের

চিত্র ১। একটি আদর্শ বীজতলার নমুনা।

মাটি দিয়ে বেড তৈরি করা যায়। এরপর বেডের উপরের মাটি বাঁশ বা কাঠের চেপটা লাঠি দিয়ে সমান করতে হবে। বেড তৈরির ৩/৪ ঘণ্টা পর বীজ বোনা উচিত। বীজতলা তৈরির জন্য দু'বেডের মাঝে যে নালা তৈরি হয় তা খুবই প্রয়োজন। এ নালা যেমন সেচের কাজে লাগে তেমনি পানি নিষ্কাশন বা প্রয়োজনে সার/ওষুধ ইত্যাদি প্রয়োগ করা সহজ হয়। বাকানি রোগপ্রবণ এলাকায় আবশ্যিকভাবে ছত্রাকনাশক দ্বারা বীজ শোধন করতে হবে।

বীজতলায় বপন

প্রতি বর্গমিটার বেডে ৮০-১০০ গ্রাম বীজ বুনুন। অঙ্কুরিত বীজ বেডের উপর সমানভাবে বুনে দিতে হবে। বীজ বেডের উপর থাকে বলে পাখিদের নজরে পড়ে। তাই বপনের সময় থেকে ৪/৫ দিন পর্যন্ত পাহারা দিয়ে পাখি তাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে এবং নালা ভর্তি করে পানি রাখতে হবে। সারণী ৫-এ জাতভেদে বীজ বপনের পঞ্জিকা দেয়া হলো।

অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় বীজতলার যত্ন

শৈত্য প্রবাহের সময় বীজতলা স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঢেকে দিলে, বীজতলার পানি সকালে বের করে দিয়ে আবার নতুন পানি দিলে, প্রতিদিন সকালে চারার উপর জমাকৃত শিশির ঝরিয়ে দিলে চারা ঠাণ্ডার প্রকোপ থেকে রক্ষা পায় এবং স্বাভাবিকভাবে বাড়তে পারে (বিস্তারিত দেখুন ৭০-৭১ পৃষ্ঠায়)।

সাধারণ পরিচর্যা

বীজতলায় সব সময় নালা ভর্তি পানি রাখা উচিত। বীজ গজানোর ৪-৫ দিন পর বেডের উপর ২-৩ সেন্টিমিটার পানি রাখলে আগাছা ও পাখির আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বোরো মৌসুমে শীতের জন্য চারার বাড়-বাড়তি ব্যাহত হয়। এ কারণে রাতে বীজতলা পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখলে ঠাণ্ডাজনিত ক্ষতি থেকে চারা রক্ষা পায় এবং চারার বাড়-বাড়তি ভাল হয়। চারাগাছ হলদে হয়ে গেলে প্রতি বর্গমিটারে ৭ গ্রাম করে ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগ করলেই চলে। ইউরিয়া প্রয়োগের পর চারা সবুজ না হলে গন্ধকের অভাব হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। তখন প্রতি বর্গমিটারে ১০ গ্রাম করে জিপসাম সার উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সারের উপরিপ্রয়োগের পর বীজতলার পানি ধরে রাখা উচিত।

চারা উঠানো

বীজতলায় বেশি করে পানি দিয়ে বেডের মাটি নরম করে নিতে হবে। এমনভাবে চারা উঠাতে হবে যেন চারার কাণ্ড মুচড়ে বা ভেঙ্গে না যায়। শুকনো খড় ভিজিয়ে নিয়ে বাণ্ডিল বাঁধতে হবে।

চারা বহন

বীজতলা থেকে রোপণের জন্য চারা বহন করার সময় পাতা ও কাণ্ড মোড়ানো পরিহার করতে হবে। এজন্য ঝুড়ি বা টুকরিতে সারি করে সাজিয়ে পরিবহন করা উচিত। বস্তাবন্দী করে ধানের চারা কোনক্রমেই বহন করা উচিত নয়।

জমি তৈরি

যেসব এলাকার মাটি অধিক সময় জলমগ্ন থাকার কারণে নরম থাকে সেসব জমির আগাছা পরিষ্কার করে বিনা চাষে ধান রোপণ করলেও আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায়। এসব জমিতে ফলনের উপর চাষের প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। জমির উপরিভাগের মাত্র ৮-১০ সেন্টিমিটার ক্রমাগত চাষের জন্য অনুর্বর হলে কিঞ্চিৎ গভীর চাষ ভাল ফলন পেতে সাহায্য করে। চাষ সরাসরি ধানের ফলন না বাড়ালেও এতে রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা সহজতর হয়। মাটির প্রকারভেদে ৩-৫ বার চাষ ও মই দিলেই চলে।

জমিতে প্রয়োজন মতো পানি দিয়ে মাটির প্রকারভেদে ২-৩টি চাষ ও মই দিতে হবে যেন মাটি থকথকে কাদাময় হয়। জমি উঁচুনিচু থাকলে মই ও কোদাল দিয়ে সমান করে নিতে হবে। সঠিক পদ্ধতিতে, সময়মতো এবং উত্তমরূপে জমি তৈরি করলে প্রাথমিকভাবে যেসব আগাছা জন্মায় তাদের দমন সহজ হয়। ভালভাবে জমি তৈরি করলে যেসব উপকার পাওয়া যায় সেগুলো হলো-

- উত্তমরূপে কাদা করে জমি তৈরি করলে বৃষ্টি বা সেচের পানির অপচয় কম হয়।
- প্রথম চাষের পর অন্তত সাত দিন পর্যন্ত জমিতে পানি আটকে রাখা প্রয়োজন। এর ফলে জমির আগাছা, খড় ইত্যাদি পচে জৈব সারে পরিণত হবে যা পরবর্তীতে গাছের খাদ্য হিসেবে নাইট্রোজেন ও অন্যান্য খাদ্যোপাদান ব্যবহার করে।
- কাদা করে জমি তৈরি করলে মাটিতে অক্সিজেনের শূন্য স্তর সৃষ্টি হওয়ার ফলে নাইট্রোজেন সারের কার্যকারিতা বেড়ে যায়।
- উত্তমরূপে কাদা করা জমিতে অতি সহজে ধানের চারা রোপণ করা যায়; এবং
- এরকম জমি সমতল হয় এবং সেচের পানি জমিতে সমানভাবে জমতে পারে।

শেষ চাষ ও মই দেয়ার সময় লক্ষ রাখতে হবে যেন জমি যথেষ্ট সমতল হয়। শেষ চাষের সময় অনুমোদিত হারে সার প্রয়োগ করতে হবে (সারণী ৬)। আউশ ধান কাটতে দেরী হলে পরবর্তী আমন ধানের চাষ নাবি হয়, ফলে উফশী ধানের ফলন কম হয়। এ কারণে আউশ ধান কাটার পর পরই চারা রোপণ করা দরকার।

চারা রোপণ

সাধারণভাবে আউশে ২০-২৫ দিনের, রোপা আমনে ২৫-৩০ দিনের এবং বোরোতে ৩৫-৪৫ দিনের চারা রোপণ করা উচিত। রোপণের সময় জমিতে ছিপছিপে পানি থাকলেই চলে। প্রতি গুছিতে একটি করে সতেজ চারা রোপণ করাই যথেষ্ট। এ হারে রোপণ করলে এক হেক্টর জমিতে ৮-১০ কেজি বীজের চারা লাগে। প্রয়োজনে ২-৩টি পর্যন্ত চারা এক গুছিতে রোপণ করা যেতে পারে। তখন দ্বিগুণ হারে বীজের প্রয়োজন হবে। মাটির ২-৩ সেন্টিমিটার গভীরতায় চারা রোপণ করা উত্তম। সঠিক গভীরতায় চারা রোপণ করলে চারার বাড়-বাড়তি দ্রুত শুরু হয় এবং কুশির সংখ্যা বেড়ে যায়।

সারিতে চারা রোপণ করতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ২০-২৫ সেন্টিমিটার এবং সারিতে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব বজায় রাখতে হবে ১৫-২০ সেন্টিমিটার। বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক গুছি থাকলে কাঙ্ক্ষিত ফলন

হবে। চারা রোপণের ৭-১০ দিনের মধ্যে কোন চারা মারা গেলে সেখানে নতুন চারা রোপণ করতে হবে। সারিবদ্ধভাবে চারা রোপণ করলে নিড়ানি যন্ত্র ব্যবহার করা সহজ হয় এবং তাতে খরচ কমে। গুটি ইউরিয়া ব্যবহার করলে ইউরিয়া সারের খরচ কমে এবং প্রত্যাশিত ফলন পাওয়া যায়। উপরন্তু সঠিক দূরত্বে চারা রোপণ হলে প্রত্যেক গাছ সমান আলো, বাতাস ও সার গ্রহণের সুবিধা পাবে; আর তা ভাল ফলনে সহায়ক হবে। সারণী ৫-এ জাত ভেদে চারার বয়স, রোপণের জন্য গাছ থেকে গাছের এবং সারি থেকে সারির দূরত্ব বর্ণনা করা হয়েছে।

সারণী ৫। মৌসুম-ভিত্তিক ব্রি ধানের জাত ও চাষাবাদ পঞ্জিকা।

জাত	বীজ বপন	চারার বয়স	চারার দূরত্ব (সেমি)	সারির দূরত্ব (সেমি)	ফসল কর্তনের সময়
		রোপা আউশ			
বিআর১	১৫ চৈত্র-৫ বৈশাখ (২৯ মার্চ-১৮ এপ্রিল)	২০-২৫	১৫	২০	১৫ শ্রাবণ-৫ ভাদ্র (৩০ জুলাই-২০ আগস্ট)
বিআর২	১৫-৩০ চৈত্র (২৯ মার্চ-১৩ এপ্রিল)	২০-৩০	১৫	২০	২০ শ্রাবণ-৫ ভাদ্র (৪ আগস্ট-২০ আগস্ট)
বিআর৩	১৫-৩০ চৈত্র (২৯ মার্চ-১৩ এপ্রিল)	২০-৩০	১৫	২০	২৫ শ্রাবণ-১০ ভাদ্র (৯ আগস্ট-২৫ আগস্ট)
বিআর৬	১৫ চৈত্র-৫ বৈশাখ (২৯ মার্চ-১৮ এপ্রিল)	২০-২৫	১৫	২০	১০-৩০ শ্রাবণ (২৫ জুলাই-১৪ আগস্ট)
বিআর৭	১৫-৩০ চৈত্র (২৯ মার্চ-১৩ এপ্রিল)	২০-৩০	১৫	২০	২৫ শ্রাবণ-১০ ভাদ্র (৯ আগস্ট-২৫ আগস্ট)
বিআর৮	১৫-৩০ চৈত্র (২৯ মার্চ-১৩ এপ্রিল)	২০-৩০	১৫	২০	২০ শ্রাবণ-৫ ভাদ্র (৪ আগস্ট-২০ আগস্ট)
বিআর৯	১৫-৩০ চৈত্র (২৯ মার্চ-১৩ এপ্রিল)	২০-৩০	১৫	২০	২০ শ্রাবণ-৫ ভাদ্র (৪ আগস্ট-২০ আগস্ট)
বিআর১৪	১৫ চৈত্র-৫ বৈশাখ (২৯ মার্চ-১৮ এপ্রিল)	২০-২৫	১৫	২০	১৫ শ্রাবণ-৫ ভাদ্র (৩০ জুলাই-২০ আগস্ট)
বিআর১৬	১৫-৩০ চৈত্র (২৯ মার্চ-১৩ এপ্রিল)	২০-৩০	১৫	২০	২৫ শ্রাবণ-১০ ভাদ্র (৯ আগস্ট-২৫ আগস্ট)
বিআর২৬	৫-১৭ বৈশাখ (১৮-৩০ এপ্রিল)	২০-২৫	১৫	২০	৩০ শ্রাবণ-২০ ভাদ্র (১৪ আগস্ট-৪ সেপ্টেম্বর)
ব্রি ধান২৭	৫-১৭ বৈশাখ (১৮-৩০ এপ্রিল)	২০-২৫	১৫	২০	৩০ শ্রাবণ-২০ ভাদ্র (১৪ আগস্ট-৪ সেপ্টেম্বর)
ব্রি ধান৪৮	৫-১৭ বৈশাখ (১৮-৩০ এপ্রিল)	২০-২৫	১৫	২০	৩০ শ্রাবণ-২০ ভাদ্র (১৪ আগস্ট-৪ সেপ্টেম্বর)
ব্রি ধান৫৫	৫-১৭ বৈশাখ (১৮-৩০ এপ্রিল)	২০-২৫	১৫	২০	৩০ শ্রাবণ-২০ ভাদ্র (১৪ আগস্ট-৪ সেপ্টেম্বর)
		বোনা আউশ			
বিআর২০	১০ চৈত্র-১০ বৈশাখ (২৪ মার্চ-২৩ এপ্রিল)				২০ আষাঢ়-২০ শ্রাবণ (৪ জুলাই-৪ আগস্ট)

সারণী ৫। ক্রমশ।

জাত	বীজ বপন	চারার বয়স	চারার দূরত্ব (সেমি)	সারির দূরত্ব (সেমি)	ফসল কর্তনের সময়
বিআর২১	১০ চৈত্র–১০ বৈশাখ (২৪ মার্চ–২৩ এপ্রিল)				২০ আষাঢ়–২০ শ্রাবণ (৪ জুলাই–৪ আগস্ট)
বিআর২৪	১০ চৈত্র–১০ বৈশাখ (২৪ মার্চ–২৩ এপ্রিল)				২০ আষাঢ়–২০ শ্রাবণ (৪ জুলাই–৪ আগস্ট)
ব্রি ধান২৭	১০ চৈত্র–১০ বৈশাখ (২৪ মার্চ–২৩ এপ্রিল)				২০ আষাঢ়–২০ শ্রাবণ (৪ জুলাই–৪ আগস্ট)
ব্রি ধান৪২	১০ চৈত্র–১০ বৈশাখ (২৪ মার্চ–২৩ এপ্রিল)				২০ আষাঢ়–২০ শ্রাবণ (৪ জুলাই–৪ আগস্ট)
ব্রি ধান৪৩	১০ চৈত্র–১০ বৈশাখ (২৪ মার্চ–২৩ এপ্রিল)				২০ আষাঢ়–২০ শ্রাবণ (৪ জুলাই–৪ আগস্ট)
ব্রি ধান৬৫	১০ চৈত্র–১০ বৈশাখ (২৪ মার্চ–২৩ এপ্রিল)				২০ আষাঢ়–২০ শ্রাবণ (৪ জুলাই–৪ আগস্ট)
		রোপা আমন			
বিআর৩	১৫–২০ আষাঢ় (২৯ জুন–৪ জুলাই)	২৫–৩০	১৫	২৫	১০–১৫ অগ্রহায়ণ (২৪–২৯ নভেম্বর)
বিআর৪	১–৩০ আষাঢ় (১৫ জুন–১৪ জুলাই)	৩০–৩৫	১৫	২৫	১০–১৫ অগ্রহায়ণ (২৪–২৯ নভেম্বর)
বিআর৫	১০–১৫ শ্রাবণ (২৫–৩০ জুলাই)	২৫–৩০	১৫	২৫	১০–১৫ অগ্রহায়ণ (২৪–২৯ নভেম্বর)
বিআর১০	২৫ জ্যৈষ্ঠ–১৫ আষাঢ় (৮–২৯ জুন)	২৫–৩০	১৫	২৫	১৫ কার্তিক–১৫ অগ্রহায়ণ (৩০ অক্টোবর–২৯ নভেম্বর)
বিআর১১	২৫ জ্যৈষ্ঠ–১৫ আষাঢ় (৮–২৯ জুন)	২৫–৩০	১৫	২৫	৫ কার্তিক–১০ অগ্রহায়ণ (২০ অক্টোবর–২৪ নভেম্বর)
বিআর২২	১ আষাঢ়–২৫ শ্রাবণ (১৫ জুন–৯ আগস্ট)	৩০–৫০*	১৫	২৫	১৫–৩০ অগ্রহায়ণ (২৯ নভেম্বর–১৪ ডিসেম্বর)
বিআর২৩	১ আষাঢ়–২৫ শ্রাবণ (১৫ জুন–৯ আগস্ট)	৩০–৫০*	১৫	২৫	১৫–৩০ অগ্রহায়ণ (২৯ নভেম্বর–১৪ ডিসেম্বর)
বিআর২৫	১৫–৩০ আষাঢ় (২৯ জুন–১৪ জুলাই)	২৫–৩০	১৫	২০	১–১৫ অগ্রহায়ণ (১৫–২৯ নভেম্বর)
ব্রি ধান৩০	২৫ জ্যৈষ্ঠ–১৫ আষাঢ় (৮–২৯ জুন)	২৫–৩০	১৫	২৫	১৫ কার্তিক–১৫ অগ্রহায়ণ (৩০ অক্টোবর–২৯ নভেম্বর)
ব্রি ধান৩১	১৫–৩০ আষাঢ় (২৯ জুন–১৪ জুলাই)	২৫–৩০	১৫	২০	২৫ কার্তিক–১০ অগ্রহায়ণ (৯–২৪ নভেম্বর)
ব্রি ধান৩২	১৫–৩০ আষাঢ় (২৯ জুন–১৪ জুলাই)	২৫–৩০	১৫	২০	২৫ কার্তিক–১০ অগ্রহায়ণ (৯–২৪ নভেম্বর)
ব্রি ধান৩৩	২১–৩০ আষাঢ় (৫–১৪ জুলাই)	২০–২৫	১৫	২০	২১–৩০ কার্তিক (৫–১৪ নভেম্বর)
ব্রি ধান৩৪	৫–১০ শ্রাবণ (২০–২৫ জুলাই)	২৫–৩০	১৫	২০	৫–১০ অগ্রহায়ণ (১৯–২৪ নভেম্বর)

সারণী ৫। ক্রমশ।

জাত	বীজ বপন	চারার বয়স	চারার দূরত্ব (সেমি)	সারির দূরত্ব (সেমি)	ফসল কর্তনের সময়
ব্রি ধান৩৭	৫–১০ শ্রাবণ (২০–২৫ জুলাই)	২৫–৩০	১৫	২০	৫–১০ অগ্রহায়ণ (১৯–২৪ নভেম্বর)
ব্রি ধান৩৮	৫–১০ শ্রাবণ (২০–২৫ জুলাই)	২৫–৩০	১৫	২০	৫–১০ অগ্রহায়ণ (১৯–২৪ নভেম্বর)
ব্রি ধান৩৯	২১–৩০ আষাঢ় (৫–১৪ জুলাই)	২০–২৫	১৫	২০	২১–৩০ কার্তিক (৫–১৪ নভেম্বর)
ব্রি ধান৪০	১০–৩১ আষাঢ় (২৪ জুন–১৫ জুলাই)	৩০–৪০	১৫	২৫	১৫–২৫ অগ্রহায়ণ (২৯ নভেম্বর–৯ ডিসেম্বর)
ব্রি ধান৪১	১০–৩১ আষাঢ় (২৪ জুন–১৫ জুলাই)	৩০–৪০	১৫	২৫	১৫–২৫ অগ্রহায়ণ (২৯ নভেম্বর–৯ ডিসেম্বর)
ব্রি ধান৪৪	১০–৩১ আষাঢ় (২৪ জুন–১৫ জুলাই)	৩০–৪০	১৫	২৫	১৫–২৫ অগ্রহায়ণ (২৯ নভেম্বর–৯ ডিসেম্বর)
ব্রি ধান৪৬	১ আষাঢ়–২৫ শ্রাবণ (১৫ জুন–৯ আগস্ট)	৩০–৫০*	১৫	২৫	১৫–৩০ অগ্রহায়ণ (২৯ নভেম্বর–১৪ ডিসেম্বর)
ব্রি ধান৪৯	১–৩০ আষাঢ় (১৫ জুন-১৪ জুলাই)	৩০–৩৫	১৫	২৫	১০–১৫ অগ্রহায়ণ (২৪–২৯ নভেম্বর)
ব্রি ধান৫১	২৫ জ্যৈষ্ঠ–১৫ আষাঢ় (৮–২৯ জুন)	২৫–৩০	১৫	২৫	৫ কার্তিক–১০ অগ্রহায়ণ (২০ অক্টোবর–২৪ নভেম্বর)
ব্রি ধান৫২	২৫ জ্যৈষ্ঠ–১৫ আষাঢ় (৮–২৯ জুন)	২৫–৩০	১৫	২৫	৫ কার্তিক–১০ অগ্রহায়ণ (২০ অক্টোবর–২৪ নভেম্বর)
ব্রি ধান৫৩	১৭–৩১ আষাঢ় (১–১৫ জুলাই)	২৫–৩০	১৫	২৫	১৭ কার্তিক–১ অগ্রহায়ণ (১–১৫ নভেম্বর)
ব্রি ধান৫৪	১৭–৩১ আষাঢ় (১–১৫ জুলাই)	২৫–৩০	১৫	২৫	১৭ কার্তিক–১ অগ্রহায়ণ (১–১৫ নভেম্বর)
ব্রি ধান৫৬	২১–৩০ আষাঢ় (৫–১৪ জুলাই)	২০–২৫	১৫	২০	২১–৩০ কার্তিক (৫–১৪ নভেম্বর)
ব্রি ধান৫৭	২১–৩০ আষাঢ় (৫–১৪ জুলাই)	২০–২৫	১৫	২০	২১–৩০ কার্তিক (৫–১৪ নভেম্বর)
ব্রি ধান৬২	২১–৩০ আষাঢ় (৫–১৪ জুলাই)	২০–২৫	১৫	২০	২১–৩০ কার্তিক (৫–১৪ নভেম্বর)
ব্রি ধান৬৬	২১–৩০ আষাঢ় (৫–১৪ জুলাই)	২০–২৫	১৫	২০	২১–৩০ কার্তিক (৫–১৪ নভেম্বর)
ব্রি হাইব্রিড ধান৪	১–৩০ আষাঢ় (১৫ জুন-১৪ জুলাই)	২৫–৩০	১৫	২০	২৭–৩০ আশ্বিন (১২–১৫ অক্টোবর)
		বোরো			
বিআর১	১-১৫ অগ্রহায়ণ (১৫-২৯ নভেম্বর)	৩৫–৪০	১৫	২০	১-১৫ বৈশাখ (১৪-২৮ এপ্রিল)
বিআর২	২০ কার্তিক–৫ অগ্রহায়ণ (৪–১৯ নভেম্বর)	৪০–৪৫	১৫	২৫	১–১৫ বৈশাখ (১৪–২৮ এপ্রিল)

সারণী ৫। ক্রমশ।

জাত	বীজ বপন	চারার বয়স	চারার দূরত্ব (সেমি)	সারির দূরত্ব (সেমি)	ফসল কর্তনের সময়
বিআর৩	১৫-৩০ কার্তিক (৩০ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর)	৪০-৪৫	১৫	২৫	৫-২০ বৈশাখ ১৮ এপ্রিল-৩ মে
বিআর৬	১-১৫ অগ্রহায়ণ (১৫-২৯ নভেম্বর)	৩৫-৪০	১৫	২০	১-১৫ বৈশাখ (১৪-২৮ এপ্রিল)
বিআর৭	২০ কার্তিক-৫ অগ্রহায়ণ (৪-১৯ নভেম্বর)	৪০-৪৫	১৫	২০	১-১৫ বৈশাখ (১৪-২৮ এপ্রিল)
বিআর৮	২০ কার্তিক-৫ অগ্রহায়ণ (৪-১৯ নভেম্বর)	৪০-৪৫	১৫	২৫	১-১৫ বৈশাখ (১৪-২৮ এপ্রিল)
বিআর৯	২০ কার্তিক-৫ অগ্রহায়ণ (৪-১৯ নভেম্বর)	৪০-৪৫	১৫	২৫	১-১৫ বৈশাখ (১৪-২৮ এপ্রিল)
বিআর১২	১৫-৩০ কার্তিক (৩০ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর)	৪৫-৫০	১৫	২৫	৫-২০ বৈশাখ ১৮ এপ্রিল-৩ মে
বিআর১৪	২০ কার্তিক-৫ অগ্রহায়ণ (৪-১৯ নভেম্বর)	৪০-৪৫	১৫	২৫	১-১৫ বৈশাখ (১৪-২৮ এপ্রিল)
বিআর১৫	১৫-৩০ কার্তিক (৩০ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর)	৪০-৪৫	১৫	২৫	১-১৫ বৈশাখ (১৪-২৮ এপ্রিল)
বিআর১৬	১৭ কার্তিক-১৬ অগ্রহায়ণ (১-৩০ নভেম্বর)	৪০-৪৫	১৫	২৫	২৫ বৈশাখ-৬ জ্যৈষ্ঠ (৮-২০ মে)
বিআর১৭	১৫-৩০ কার্তিক (৩০ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর)	৪০-৪৫	১৫	২৫	২০ চৈত্র-৫ বৈশাখ (৩-১৮ এপ্রিল)
বিআর১৮	১৫-৩০ কার্তিক (৩০ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর)	৪০-৪৫	১৫	২৫	২০ চৈত্র-৫ বৈশাখ (৩-১৮ এপ্রিল)
বিআর১৯	১৫-৩০ কার্তিক (৩০ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর)	৪০-৪৫	১৫	২৫	২০ চৈত্র-৫ বৈশাখ (৩-১৮ এপ্রিল)
বিআর২৬	১-১৫ অগ্রহায়ণ (১৫-২৯ নভেম্বর)	৩৫-৪০	১৫	২০	২০ চৈত্র-৫ বৈশাখ (৩-১৮ এপ্রিল)
ব্রি ধান২৮*	১-১৫ অগ্রহায়ণ (১৫-২৯ নভেম্বর)	৩৫-৪০	১৫	২০	২০ চৈত্র-৫ বৈশাখ (৩-১৮ এপ্রিল)
ব্রি ধান২৯	১৭ কার্তিক-১৬ অগ্রহায়ণ (১-৩০ নভেম্বর)	৪০-৪৫	১৫	২৫	২৫ বৈশাখ-৬ জ্যৈষ্ঠ (৮-২০ মে)
ব্রি ধান৩৫	২০ কার্তিক-৫ অগ্রহায়ণ (৪-১৯ নভেম্বর)	৪০-৪৫	১৫	২৫	১-১৫ বৈশাখ (১৪-২৮ এপ্রিল)
ব্রি ধান৩৬	১-১৫ অগ্রহায়ণ (১৫-২৯ নভেম্বর)	৩৫-৪০	১৫	২০	২০ চৈত্র-৫ বৈশাখ (৩-১৮ এপ্রিল)
ব্রি ধান৪৫	১-১৫ অগ্রহায়ণ (১৫-২৯ নভেম্বর)	৩৫-৪০	১৫	২০	২০ চৈত্র-৫ বৈশাখ (৩-১৮ এপ্রিল)
ব্রি ধান৪৭	১-১৫ অগ্রহায়ণ (১৫-২৯ নভেম্বর)	৩৫-৪০	১৫	২০	১-১৫ বৈশাখ (১৪-২৮ এপ্রিল)
ব্রি ধান৫০	১-২০ অগ্রহায়ণ (১৫ নভেম্বর-৪ ডিসেম্বর)	৩৫-৪০	১৫	২৫	১৫-২৫ বৈশাখ (২৮ এপ্রিল-৮ মে)

সারণী ৫। ক্রমশ।

জাত	বীজ বপন	চারার বয়স	চারার দূরত্ব (সেমি)	সারির দূরত্ব (সেমি)	ফসল কর্তনের সময়
ব্রি ধান৫৫	১-১৫ অগ্রহায়ণ (১৫-২৯ নভেম্বর)	৩৫-৪০	১৫	২০	২০ চৈত্র-৫ বৈশাখ (৩-১৮ এপ্রিল)
ব্রি ধান৫৮	১-২০ অগ্রহায়ণ (১৫ নভেম্বর-৪ ডিসেম্বর)	৩৫-৪০	১৫	২৫	১৫-২৫ বৈশাখ (২৮ এপ্রিল-৮ মে)
ব্রি ধান৫৯	১-১৫ অগ্রহায়ণ (১৫-২৯ নভেম্বর)	৩৫-৪০	১৫	২০	২০ চৈত্র-৫ বৈশাখ (৩-১৮ এপ্রিল)
ব্রি ধান৬০	১-১৫ অগ্রহায়ণ (১৫-২৯ নভেম্বর)	৩৫-৪০	১৫	২০	২০ চৈত্র-৫ বৈশাখ (৩-১৮ এপ্রিল)
ব্রি ধান৬১	১-১৫ অগ্রহায়ণ (১৫-২৯ নভেম্বর)	৩৫-৪০	১৫	২০	১-১৫ বৈশাখ (১৪-২৮ এপ্রিল)
ব্রি ধান৬৩	১-১৫ অগ্রহায়ণ (১৫-২৯ নভেম্বর)	৩৫-৪০	১৫	২০	২০ চৈত্র-৫ বৈশাখ (৩-১৮ এপ্রিল)
ব্রি ধান৬৪	১-১৫ অগ্রহায়ণ (১৫-২৯ নভেম্বর)	৩৫-৪০	১৫	২০	২০ চৈত্র-৫ বৈশাখ (৩-১৮ এপ্রিল)
ব্রি ধান৬৭	১-১৫ অগ্রহায়ণ (১৫-২৯ নভেম্বর)	৩৫-৪০	১৫	২০	১-১৫ বৈশাখ (১৪-২৮ এপ্রিল)
ব্রি ধান৬৮	১-১৫ অগ্রহায়ণ (১৫-২৯ নভেম্বর)	৩৫-৪০	১৫	২০	২০ চৈত্র-৫ বৈশাখ (৩-১৮ এপ্রিল)
ব্রি ধান৬৯	১৭ কার্তিক-১৬ অগ্রহায়ণ (১-৩০ নভেম্বর)	৪০-৪৫	১৫	২৫	২৫ বৈশাখ-৬ জ্যৈষ্ঠ (৮-২০ মে)
ব্রি হাইব্রিড ধান১	১-৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ নভেম্বর-১৪ ডিসেম্বর)	৩০-৩৫	১৫	২০	৫-২০ বৈশাখ (১৮ এপ্রিল-৩ মে)
ব্রি হাইব্রিড ধান২	১-৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ নভেম্বর-১৪ ডিসেম্বর)	৩০-৩৫	১৫	২০	২৫ চৈত্র-৫ বৈশাখ (৮-১৮ এপ্রিল)
ব্রি হাইব্রিড ধান৩	১-৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ নভেম্বর-১৪ ডিসেম্বর)	৩০-৩৫	১৫	২০	২৫ চৈত্র-৫ বৈশাখ (৮-১৮ এপ্রিল)

*শীতের জন্য উত্তরবঙ্গে বীজ বপন এক সপ্তাহ পেছাতে পারে।

ধানের দ্বিরোপণ পদ্ধতি

জলাবদ্ধতা, পূর্ববর্তী ফসল বা অন্য কোন কারণে যদি রোপণ বিলম্বিত হয় তবে বেশি বয়সের চারা ব্যবহারের পরিবর্তে দ্বিরোপণ পদ্ধতিতে ধান আবাদ একটি ভাল প্রযুক্তি। এ প্রযুক্তি রংপুর অঞ্চলে 'বোলান' এবং জামালপুর অঞ্চলে 'গাছি' নামে পরিচিত। এ পদ্ধতিতে আমন মৌসুমে ২৫-৩০ দিন ও বোরো মৌসুমে ৩৫-৪০ দিন বয়সের চারা উত্তোলন করে অন্য জমিতে ঘন করে ১০ × ১০ সেন্টিমিটার দূরত্বে সাময়িকভাবে রোপণ করা হয়। ঘনভাবে রোপণকৃত জমির প্রতি দুই সারি হতে একটি সারি সম্পূর্ণভাবে উত্তোলন করে বাকী সারির প্রতি দুই গোছা থেকে একটি করে গোছা উত্তোলন করতে হয়। ফলে তিন-চতুর্থাংশ চারা উঠে যায় এবং বাকী এক-চতুর্থাংশ চারা উক্ত জমিতে ২০ × ২০

সেন্টিমিটার দূরত্বে থেকে যায়। অতএব উত্তোলিত চারা দিয়ে ঘনভাবে রোপিত জমির তিনগুণ জমি রোপণ করা সম্ভব। সাধারণত মৌসুমভেদে ২৫-৪০ দিন পর ঘনভাবে রোপণকৃত জমি হতে গোছা উত্তোলন করে মূল জমিতে ২০ × ২০ সেন্টিমিটার দূরত্বে রোপণ (দ্বিরোপণ) করা হয়। মৌসুমভেদে দ্বিরোপিত জমির ফসল বেশি বয়সের চারা দিয়ে বিলম্বে রোপিত ফসলের চেয়ে ৭-১০ দিন আগে পাকে; তবে সঠিক সময়ে সঠিক বয়সের চারা দিয়ে রোপিত ফসল হতে ৮-১২ দিন পরে পাকে। অনুরূপভাবে দ্বিরোপিত ধানের ফলন বেশি বয়সের চারা দিয়ে বিলম্বে রোপিত ধানের চেয়ে ১০-১৫% বেশি হয়, যদিও সঠিক সময়ে সঠিক বয়সের চারা দিয়ে রোপিত ধানের চেয়ে ১০-১৫% কম হয়। দ্বিরোপণের ক্ষেত্রে অধিক জীবনকাল সম্পন্ন জাত যেমন, বোরো মৌসুমে ব্রি ধান২৯ এবং আমন মৌসুমে ব্রি ধান৪৯ অধিক উপযোগী। দ্বিরোপণের মাধ্যমে আমন মৌসুমে সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে আলোক-অসংবেদনশীল জাত রোপণ করেও হেক্টর প্রতি ৩ টনের অধিক ফলন পাওয়া সম্ভব। এ পদ্ধতিতে চারার উচ্চতা বৃদ্ধি পায়, ফলে অগভীর জলাবদ্ধ অবস্থায়ও রোপণ করা সম্ভব হয়। তাছাড়াও এ পদ্ধতিতে মূল জমিতে ফসলের অবস্থান কাল কমানো যায়, যা প্রান্তিক খরা এড়াতে সহায়ক হয়। অধিকন্তু এ পদ্ধতিতে অধিক বয়সের চারার কারণে ফলন হ্রাসের ঝুঁকি কমানো যায়।

সার ব্যবস্থাপনা

সারের মাত্রা

ভাল ফলনের জন্য সুষম সারের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সার প্রয়োগ করতে দুটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন। প্রথমত, আবহাওয়া ও মাটির উর্বরতার মান যাচাই এবং ধানের জাত, জীবনকাল ও ফলন মাত্রার উপর ভিত্তি করে সারের মাত্রা ঠিক করা।

দ্বিতীয়ত, সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য কোন সার কখন ও কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে তা নির্ধারণ করা। সার ব্যবহার করে অধিক উৎপাদন ও আর্থিকভাবে লাভবান হওয়াই সকলের কাম্য। কয়েকটি সারের পরবর্তী ফসলের উপর প্রভাব থাকায় সার প্রয়োগ একক ফসল-ভিত্তিক না করে ফসলচক্র-ভিত্তিক করাই ভাল।

মৌসুম ও বিভিন্ন জাতের জীবনকাল ও ফলনের তারতম্যভেদে বিভিন্ন সারের মাত্রা মাঝারি গড় উৎপাদনের লক্ষ্যে সাধারণ ব্যবহারের জন্য সারণী ৬-এ উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য মাটির উর্বরতা ও ফলনের লক্ষ্যমাত্রার উপর ভিত্তি করে উল্লিখিত মাত্রা কম-বেশি হতে পারে। জৈব সার, যেমন ধৈঞ্চা বা ডাল জাতীয় ফসল, পচা গোবর, মুরগির বিষ্ঠা, বসতবাড়ির আবর্জনা ব্যবহারের প্রতি বিশেষ নজর দেয়া প্রয়োজন। জৈব সারের সাথে রাসায়নিক সার সমন্বয় করে ব্যবহার করলে রাসায়নিক সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় ও ভাল ফলন পাওয়া যায়।

সার প্রয়োগের নিয়মাবলী : ধানগাছের বাড়-বাড়তির বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন মাত্রায় নাইট্রোজেন বা ইউরিয়া সারের প্রয়োজন হয়। প্রথম দিকের কুশি গজানোর সময় ইউরিয়া সার প্রয়োগ করলে তা থেকে গাছ প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন গ্রহণ করে কার্যকরী কুশির সংখ্যা

বাড়িয়ে দেয়। সর্বোচ্চ কুশি উৎপাদন থেকে কাইচথোড় আসা অবধি অর্থাৎ ছড়ার বাড়-বাড়তির সময় গাছ প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন পেলে প্রতি ছড়ার পুষ্ট ধানের সংখ্যা বাড়ে। সবশেষে ফুল আসার পর ধানগাছ যে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে তা ধানের দানা পুষ্ট করতে সহায়তা করে; ফলে ধানের ওজন বৃদ্ধি পায়। সে অনুযায়ী, ইউরিয়া সার ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্য হলো, প্রথম দিকেই চারার কুশির সংখ্যা বাড়ানো। কারণ সাধারণত প্রথম দিকের কুশিতেই ছড়া ভাল হয়। তাই প্রথম দিকে কুশি বাড়ানো এবং সেসব কুশিকে সবল রাখার জন্য জমির উর্বরতার উপর নির্ভর করে প্রথম কিস্তির ইউরিয়াসহ অন্যান্য সব প্রয়োজনীয় সার জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে ছিটিয়ে প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে (সারণী ৬)। তবে মধ্যম ও উত্তম উর্বর জমিতে চারা শক্ত করে দাঁড়ানোর পর পর প্রথম কিস্তির ইউরিয়া সার ব্যবহার করা উত্তম। সার দেয়ার সময় অবশ্যই মাটিতে প্রচুর রস থাকা দরকার। শুকনো জমিতে কিংবা জমিতে বেশি পানি থাকলে অথবা ধানগাছের পাতায় পানি জমে থাকলে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা ঠিক নয়। সারের উপরিপ্রয়োগ করে নিড়ানি যন্ত্র বা উইডার দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করলে সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। মাটির সাথে সার মিশানোর ২-৩ দিন পর জমিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি রাখা দরকার। সার প্রয়োগের সময় ও পদ্ধতি বিষয়ে আরো কিছু পরামর্শ :

- মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে সারের মাত্রা নির্ণয় করা প্রয়োজন।
- জৈব সার ব্যবহার করা সম্ভব হলে তা প্রথম চাষের সময়ই জমিতে সমভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। জৈব সার খরিপ মৌসুমে ব্যবহার করাই সমীচীন।
- ইউরিয়া ছাড়া অন্যান্য সার যেমন টিএসপি, মিউরেট অব পটাশ, জিপসাম, জিঙ্ক সালফেট মাত্রানুযায়ী (সারণী ৬) জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে ছিটিয়ে প্রয়োগ করে চাষ দিয়ে মাটির সাথে ভাল করে মিশিয়ে দিতে হবে। তবে বেলে মাটিতে পটাশ সার দু'কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। তিন ভাগের দু'ভাগ জমি তৈরির শেষ সময় এবং এক-তৃতীয়াংশ শেষ কিস্তি ইউরিয়া সারের সঙ্গে প্রয়োগ করতে হবে।
- জিঙ্ক সালফেট সার ফসলচক্রের কোনো একটিতে প্রয়োগ করলে তা পরবর্তী দু'টি ফসলের জন্য প্রয়োগ না করলেও চলবে।
- ইউরিয়া সারের পরবর্তী ফসলের ওপর প্রভাব না থাকায় প্রত্যেক ফসলেই ইউরিয়া সার মাত্রানুযায়ী ব্যবহার করতে হবে।
- ইউরিয়া সার মাটিতে ক্ষণস্থায়ী এবং অপচয় হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা খুব বেশি। তাই ধানচাষে ইউরিয়া সার সাধারণত তিন কিস্তিতে সমান ভাগে ভাগ করে প্রয়োগ করতে হবে। তবে বেলে মাটিতে চার কিস্তিতে প্রয়োগ করাই সমীচীন।
- জমিতে ছিপছিপে পানি থাকা অবস্থায় ইউরিয়া সার সমভাবে ছিটানোর পর হাতড়িয়ে বা নিড়ানি দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে পারলে ভাল ফলন আশা করা যায়।
- যে জমিতে দস্তা বা গন্ধকের অভাব আছে সে জমি তৈরির সময় গন্ধক ও দস্তা সার ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু যদি কোন কারণে তা ব্যবহার করা না হয়ে থাকে তাহলে গাছের গন্ধক/দস্তার অভাবজনিত লক্ষণ বুঝে সার দিতে হবে।
- তীব্র শীতে ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগ করা যাবে না।

সারণী ৬। মৌসুম ও বিভিন্ন জাতের ব্রি ধানের জীবনকাল ও ফলনের তারতম্য ভেদে বিভিন্ন সারের মাত্রা।

মৌসুম	জীবনকাল	ইউরিয়া-টিএসপি-এমওপি-জিপসাম-দস্তা (মনোহাইড্রেট) প্রতি বিঘায় কেজি হিসেবে	প্রয়োগ পদ্ধতি*
রোপা আউশ	রোপা আউশের জাত (সারণী ১)	১৮-৭-১১-০-০	১ম কিস্তি : এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) ইউরিয়া সার জমি শেষ চাষের সময়। ২য় কিস্তি : ১/৩ ইউরিয়া সার গোছায় ৪-৫টি কুশি দেখা দিলে (সাধারণত রোপণের ১৫ দিন পর)। ৩য় কিস্তি : ১/৩ ইউরিয়া সার কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে। টিএসপি, এমওপি, গন্ধক (জিপসাম) ও দস্তা সারের পুরোটাই জমি শেষ চাষের সময় মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে।
রোপা আমন	১৪৫ দিনের বেশি দীর্ঘ মেয়াদি জাত (সুগন্ধি জাত ব্যতীত)	২৬-৮-১৪-৯-০	নিম্ন উর্বর জমি ১ম কিস্তি : এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) ইউরিয়া সার জমি শেষ চাষের সময়। ২য় কিস্তি : ১/৩ ইউরিয়া সার গোছায় ৪-৫টি কুশি দেখা দিলে (সাধারণত রোপণের ১৫-২০ দিন পর)। ৩য় কিস্তি : ১/৩ ইউরিয়া সার কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে।
	১৩৫-১৪৫ দিন (মধ্যম মেয়াদি জাত)	২২-৮-১৪-৯-০	মধ্যম-উত্তম উর্বর জমি ১ম কিস্তি : এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) ইউরিয়া সার চারা রোপণের ৭-১০ দিন পরে। ২য় কিস্তি : ১/৩ ইউরিয়া সার চারা রোপণের ২৫-৩০ দিন পরে। ৩য় কিস্তি : ১/৩ ইউরিয়া সার কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে। টিএসপি, এমওপি, গন্ধক (জিপসাম) ও দস্তা সারের পুরোটাই জমি শেষ চাষের সময় মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে।
	১২৫ দিনের কম (স্বল্প মেয়াদি জাত)	২০-৭-১১-৮-০	১ম কিস্তি : এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) ইউরিয়া সার জমি শেষ চাষের সময়। ২য় কিস্তি : ১/৩ ইউরিয়া সার গোছায় ৪-৫টি কুশি দেখা দিলে (সাধারণত রোপণের ১৫দিন পর)। ৩য় কিস্তি : ১/৩ ইউরিয়া সার কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে। টিএসপি, এমওপি, গন্ধক (জিপসাম) ও দস্তা সারের পুরোটাই জমি শেষ চাষের সময় মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে।
	আলোক-সংবেদনশীল (নাবি জাত)	২৩-৯-১৩-৮-০	১ম কিস্তি : দুই-তৃতীয়াংশ (২/৩) ইউরিয়া সার জমি শেষ চাষের সময়।

সারণী ৬। ক্রমশ।

মৌসুম	জীবনকাল	ইউরিয়া-টিএসপি-এমওপি-জিপসাম-দস্তা (মনোহাইড্রেট) প্রতি বিঘায় কেজি হিসেবে	প্রয়োগ পদ্ধতি*
	আলোক-সংবেদনশীল (নাবি জাত)		2য় কিস্তি : এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) ইউরিয়া সার কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে। টিএসপি, এমওপি, গন্ধক (জিপসাম) ও দস্তা সারের পুরোটাই জমি শেষ চাষের সময় মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে।
	সুগন্ধি জাত ও ব্রি ধান৩২	১২-৭-৮-৬-০	১ম কিস্তি : এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) ইউরিয়া সার জমি শেষ চাষে সময়। ২য় কিস্তি : ১/৩ ইউরিয়া সার গোছায় ৪-৫টি কুশি দেখা দিলে (সাধারণত রোপণের ১৫ দিন পর)। ৩য় কিস্তি : ১/৩ ইউরিয়া সার কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে। টিএসপি, এমওপি, গন্ধক (জিপসাম) ও দস্তা সারের পুরোটাই জমি শেষ চাষের সময় মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে।
বোরো	১৫০ দিনের বেশি (দীর্ঘ মেয়াদি জাত)	৪০-১৩-২২-১৫-১.৫	নিম্ন উর্বর জমি ১ম কিস্তি : এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) ইউরিয়া সার জমি শেষ চাষের সময়। ২য় কিস্তি : ১/৩ ইউরিয়া সার গোছায় কুশি দেখা দিলে (সাধারণত ১ম কিস্তির ২০-২৫ দিন পর)। ৩য় কিস্তি : ১/৩ ইউরিয়া সার কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে।
	১৫০ দিনের কম (স্বল্প মেয়াদি জাত ও ব্রি ধান৫০ (সুগন্ধি)	৩৫-১২-২০-১৫-১.৫	মধ্যম-উত্তম উর্বর জমি ১ম কিস্তি : এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) ইউরিয়া সার চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পরে। ২য় কিস্তি : ১/৩ ইউরিয়া সার চারা রোপণের ৩০-৩৫ দিন পরে। ৩য় কিস্তি : ১/৩ ইউরিয়া সার কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে। টিএসপি, এমওপি, গন্ধক (জিপসাম) ও দস্তা সারের পুরোটাই জমি শেষ চাষের সময় মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে।
	হাওড় অঞ্চলের জাত	২৭-১২-২২-৮-১.৫	কাইচথোড়ের পরে যদি নাইট্রোজেনের অভাব পরিলক্ষিত হয়, তবে বিঘা প্রতি ৪-৫ কেজি ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগ করা যেতে পারে।

*সারণী ৯ এ সারের মাত্রার বিস্তারিত নির্দেশনা দেখুন।

গন্ধক এবং দস্তা সার প্রয়োগ

ইউরিয়া সার প্রয়োগ করার পরেও ধানগাছ যদি হলদে থাকে এবং বাড়-বাড়তি কম হয় তাহলে গন্ধকের অভাব হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়। সে ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ হিসেবে জমি থেকে পানি সরিয়ে দিতে হবে। অতঃপর বিঘা প্রতি ৮ কেজি জিপসাম সার উপরিপ্রয়োগ করলে ভাল ফলন পাওয়া যাবে। তবে উপরিপ্রয়োগের সময় জিপসাম সার মাটি কিংবা ছাই অথবা ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগের সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করা ভাল। যদি ধানগাছ মাঝে মধ্যে খাটো বা বসে যায় এবং পুরনো পাতায় মরচে পড়া বাদামি রঙ থেকে কমলা লেবুর রঙ ধারণ করে এবং ধানের কুশি কম থাকে তখন দস্তার অভাব হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়। এ ক্ষেত্রেও জমি থেকে পানি সরিয়ে দিতে হবে। তারপর বিঘা প্রতি ১.৫ কেজি দস্তা সার উপরিপ্রয়োগ করতে হবে।

বিভিন্ন মাত্রার উর্বর জমি

নিম্ন উর্বর : যে জমি বোরো মৌসুমে সার ছাড়া হেক্টর প্রতি ১.০-১.৫ টনের কম ফলন দেয় এবং আমন মৌসুমে হেক্টর প্রতি ২.০-২.৫ টনের কম ফলন দেয়।

মধ্যম উর্বর : যে জমি বোরো মৌসুমে সার ছাড়া হেক্টর প্রতি ৩.০-৩.৫ টনের কম ফলন দেয় এবং আমন মৌসুমে হেক্টর প্রতি ৩.৫ টনের কম ফলন দেয়।

উত্তম উর্বর : যে জমি বোরো মৌসুমে সার ছাড়া হেক্টর প্রতি ৪.০ টনের বেশি ফলন দেয় এবং আমন মৌসুমে হেক্টর প্রতি ৩.৫-৪.০ টনের বেশি ফলন দেয়।

ইউরিয়া সার ব্যবস্থাপনায় এলসিসি

লিফ কালার চার্ট বা এলসিসি প্লাস্টিকের তৈরি চার রঙ বিশিষ্ট একটি স্কেল (চিত্র ২)। এলসিসি পদ্ধতি অবলম্বন করলে ধানগাছের চাহিদা অনুযায়ী ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা যায়। ফলে ইউরিয়া সারের খরচ কমানো ও অপচয় রোধ করা যায় এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। দেখা গেছে, এলসিসি ব্যবহারে শতকরা ২০-২৫ ভাগ ইউরিয়া সাশ্রয় করা যায়। ধানগাছে

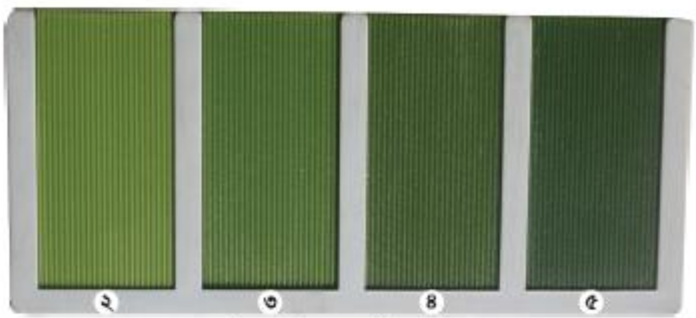

চিত্র ২। লিফ কালার চার্ট (এলসিসি)।

সবচেয়ে উপরের পুরোপুরি বের হওয়া কচি পাতার মাঝামাঝি অংশ এলসিসির উপর স্থাপন করে পাতার রঙের গাঢ়ত্ব তুলনা করতে হবে (চিত্র ৩)। পাতার রঙ এলসিসির যে কোঠার সাথে মিলে যাবে তার মানই হবে পাতার এলসিসি মান। যদি পাতার রঙ এলসিসির পাশাপাশি দু'টি রঙের মাঝামাঝি হয়, তাহলে উক্ত দু'টি নম্বরের গড় মানই হবে পাতার এলসিসি মান। এলসিসি ব্যবহারের নিয়ম সারণী ৭-এ দেখানো হয়েছে।

এলসিসি ব্যবহারে পরামর্শ

- ধানগাছ থেকে পাতা ছিঁড়ে এলসিসির মান নির্ণয় করা উচিত নয়।
- নির্বাচিত পাতাটি রোগ বা পোকার আক্রমণ মুক্ত হতে হবে।
- পাতার রঙ পরিমাপের সময় সূর্যের আলো এলসিসির ওপরে পড়লে মাপ সঠিক হবে না।
- তাই শরীরের ছায়ায় রেখে এলসিসি দিয়ে ধান গাছের পাতার রঙ মিলাতে হবে।
- সকাল ৯-১১টা বা বিকাল ২-৪টা এলসিসি দিয়ে পাতার রঙ মিলানোর উত্তম সময়।

চিত্র ৩। এলসিসি ব্যবহার।

গুটি ইউরিয়া ব্যবহার

গুটি ইউরিয়া হলো, ইউরিয়া সার দিয়ে তৈরি বড় আকারের গুটি যা দেখতে ন্যাপথালিন বলের মতো (চিত্র ৪)। গুটি ইউরিয়া ব্যবহারে সারের কার্যকরিতা শতকরা ২০-২৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ফলে ইউরিয়া সার কম লাগে। গুটি ইউরিয়া জমিতে একবারই প্রয়োগ করতে হয়। এরপর অব্যাহতভাবে গাছের প্রয়োজন অনুযায়ী নাইট্রোজেন সরবরাহ থাকায় গাছের কোন সুপ্ত ক্ষুধা থাকে না।

চিত্র ৪। গুটি ইউরিয়া।

সারণী ৭। ধান ক্ষেতে ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগে এলসিসি ব্যবহারের নিয়মাবলী।

বিষয়	আমন মৌসুম		বোরো মৌসুম	
	রোপা ধান	বোনা ধান	রোপা ধান	বোনা ধান
এলসিসি-র ক্রিটিক্যাল মান	৩.৫	৩.০	৩.৫	৩.০
প্রথমবার রঙ মাপা শুরু	রোপণের ১৫ দিন পর	বপনের ১৫ দিন পর	রোপণের ১৫-২১ দিন পর	বপনের ২৫ দিন পর
শেষবার রঙ মাপা	থোড় অবস্থা	থোড় অবস্থা	থোড় অবস্থা	থোড় অবস্থা
প্রথম ও শেষ মাপের মাঝে কতদিন পর পর রঙ মাপতে হবে	১০ দিন	১০ দিন	১০ দিন	১০ দিন
প্রতিবার রঙ মাপার সময় একটি জমিতে কয়টি গোছা ও গোছা প্রতি কয়টি পাতার রঙ মাপতে হবে	১০টি গোছা এবং প্রতি গোছার সবচেয়ে উপরের সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত ১টি পাতা		১০টি গোছা এবং প্রতি গোছায় সবচেয়ে উপরের সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত ১টি পাতা	
ইউরিয়া সার উপরি-প্রয়োগের সিদ্ধান্ত	১০টি এলসিসি মানের মধ্যে কমপক্ষে ৬টি বা তার বেশি যদি ক্রিটিক্যাল মানের কম হয় তাহলে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে		১০টি এলসিসি মানের মধ্যে কমপক্ষে ৬টি বা তার বেশি যদি ক্রিটিক্যাল মানের কম হয় তাহলে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে	
ইউরিয়া সার উপরি-প্রয়োগের পরিমাণ	প্রতি উপরিপ্রয়োগে প্রতি ৩৩ শতাংশে ৭.৫ কেজি ইউরিয়া		প্রতি উপরিপ্রয়োগে প্রতি ৩৩ শতাংশে ৯ কেজি ইউরিয়া	

বিশেষ দ্রষ্টব্য: মাপ নেয়ার তারিখে সার দেয়ার প্রয়োজন না হলে ৫ দিন পর আবার মেপে প্রয়োজনে সার দিতে হবে।

গুটি ইউরিয়া প্রয়োগের পূর্ব শর্ত হলো, ধান রোপণ করতে হবে সারিবদ্ধভাবে (চিত্র ৫)। সারি থেকে সারি এবং গোছা থেকে গোছার দূরত্ব হবে ২০ সেন্টিমিটার (৮ ইঞ্চি)। বোরো মৌসুমে চারা রোপণের ১০-১৫ দিন এবং আউশ ও আমন মৌসুমে চারা রোপণের ৭-১০ দিনের মধ্যে প্রতি চার গোছার মাঝখানে ৩-৪ ইঞ্চি কাদার গভীরে গুটি পুঁতে দিতে হবে (চিত্র ৫)। জমিতে সব সময় প্রয়োজনীয় ২-৩ সেন্টিমিটার পানি রাখতে হবে। সাধারণত আউশ ও আমন ধানের জন্য ১.৮ গ্রাম ওজনের একটি গুটি এবং বোরো ধানের জন্য ২.৭ গ্রাম ওজনের একটি গুটি ব্যবহার করতে হবে, যার হেক্টর প্রতি নাইট্রোজেন মাত্রা দাঁড়ায় যথাক্রমে

চিত্র ৫। সারি করে ধান রোপণ এবং গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ পদ্ধতি।

৫০ ও ৭৫ কেজি। ফলে আউশ ও আমন মৌসুমে প্রতি হেক্টরে ৬৫ কেজি এবং বোরো মৌসুমে ৮০-১০০ কেজি ইউরিয়া সাশ্রয় হয়।

জৈব সার প্রয়োগ

জৈব সারকে মাটির উর্বরতা শক্তির চালক হিসেবে গণ্য করা হয়। তাই জৈব বা সবুজ সার (পচা গোবর, আবর্জনা, কম্পোস্ট, ধৈঞ্চা ইত্যাদি) জমিতে বছরে একবার হলেও বিঘা প্রতি ৭০০-৮০০ কেজি (আর্দ্রতা ৬০-৭০%) প্রয়োগ করতে হবে। ফসল চক্রের প্রথমে (খরিফ-২) যে জমিতে জৈব সার ব্যবহার করা হবে সে জমিতে পরবর্তী ধান ফসলে ইউরিয়া সার নির্ধারিত মাত্রার এক-তৃতীয়াংশ কম ব্যবহার করতে হবে। টিএসপি ও এমওপি সার অর্ধেক মাত্রায় ব্যবহার করেও আশানুরূপ ফলন পাওয়া যাবে। এছাড়া ধান কাটার সময় গাছের গোড়া থেকে ২৫-৩০ সেন্টিমিটার উপরে কেটে তা মাটিতে মিশিয়ে দিলে পটাশ সারের পরিমাণ প্রয়োগ মাত্রার চেয়ে এক-তৃতীয়াংশ কম লাগে। যদি বিঘা প্রতি রোদে শুকানো ৭০০ কেজি ধানের খড় জমি তৈরির ৫-৭ দিন পূর্বে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া যায় তবে উক্ত মৌসুমে পটাশ সার ব্যবহারের প্রয়োজন নেই।

জৈব সার হিসেবে মুরগির বিষ্ঠা প্রয়োগ

ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রাসায়নিক সারের ব্যবহার অপরিহার্য। তবে বর্তমানে রাসায়নিক সারের মূল্য বৃদ্ধি ও সময়মতো প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে অনেক সময় সমস্যা দেখা দেয়। এ ক্ষেত্রে মুরগির বিষ্ঠা (পোলট্রি লিটার) রাসায়নিক সারের সাথে ব্যবহার করলে রাসায়নিক সার কম লাগবে। কারণ এতে রয়েছে গাছের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন খাদ্য উপাদান। তদুপরি বাংলাদেশে মুরগির বিষ্ঠা সহজলভ্য ও তুলনামূলক সস্তা।

প্রয়োগ পদ্ধতি : আমন মৌসুমে প্রতি বিঘা জমিতে (৩৩ শতাংশে) ৫০০ কেজি ও বোরো মৌসুমে ৮০০ কেজি মুরগির বিষ্ঠা (যার মধ্যে ৬০-৭০ ভাগ পানি থাকে) প্রয়োগ করা উত্তম। মুরগির বিষ্ঠায় চাহিদা অনুসারে ফসফরাস বিদ্যমান থাকায় প্রয়োগকৃত জমিতে ঐ মৌসুমে টিএসপি সার ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। তবে নাইট্রোজেনের অভাব পরিলক্ষিত হলে পরিমিত মাত্রায় ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগ করে আরও ভাল ফলন পাওয়া যাবে। এ ক্ষেত্রে পটাশ সার নির্ধারিত মাত্রায় ব্যবহার করলে ভাল হবে। মুরগির বিষ্ঠা প্রয়োগের পর মাটির সাথে ভাল করে মিশিয়ে দিতে হবে। মুরগির বিষ্ঠা টাটকা বা ২৫-৩০ দিন পচানো, দুই অবস্থায়ই ব্যবহার করা যায়। তবে টাটকা ব্যবহার করলে মাটিতে প্রয়োগের ৩-৪ দিন পর চারা রোপণ করতে হবে। তা না হলে রোপণের পর কিছু চারা মারা যেতে পারে। সেজন্য চারা রোপণের পর অন্তত ১৪ দিন পর্যন্ত জমিতে পানি ধরে রাখতে হবে। অপরদিকে ২৫-৩০ দিনের পচানো বিষ্ঠা প্রয়োগ করলে সাথে সাথেই চারা রোপণ করা যাবে। এতে চারা মারা যাবে না।

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ও মাটির উর্বরতা-ভিত্তিক সার প্রয়োগ

সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার ফসল, মাটি এবং পরিবেশের জন্য ভাল। এ জন্য প্রথমে জানতে হবে কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-ভিত্তিক মাটির উর্বরতা শ্রেণী (সারণী ৮) এবং জমি কোন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত। চিত্র ৬-এ জেলা-উপজেলাভিত্তিক কৃষি পরিবেশ অঞ্চল দেখানো হলো। সে অনুযায়ী সারণী ৯-এ মৌসুমভিত্তিক সারের সুষম মাত্রার সুপারিশ দেওয়া আছে।

সারণী ৮। কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-ভিত্তিক মাটির উর্বরতার শ্রেণী বিভাগ।

কৃষি পরিবেশ	মাটির উর্বরতার শ্রেণী				
অঞ্চল	নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাসিয়াম	গন্ধক	দস্তা
১	অতি নিম্ন-নিম্ন	নিম্ন-মধ্যম	অতি নিম্ন-নিম্ন	নিম্ন-মধ্যম	নিম্ন
২	অতি নিম্ন-নিম্ন	নিম্ন	নিম্ন-মধ্যম	নিম্ন	নিম্ন
৩	অতি নিম্ন-নিম্ন	নিম্ন-মধ্যম	নিম্ন-মধ্যম	নিম্ন	নিম্ন
৪	অতি নিম্ন-নিম্ন	নিম্ন-মধ্যম	নিম্ন	নিম্ন-মধ্যম	নিম্ন-মধ্যম
৫	নিম্ন	নিম্ন	মধ্যম	নিম্ন-মধ্যম	নিম্ন-মধ্যম
৬	নিম্ন	নিম্ন-মধ্যম	মধ্যম	মধ্যম	নিম্ন-মধ্যম
৭	নিম্ন	নিম্ন-মধ্যম	নিম্ন-মধ্যম	নিম্ন-মধ্যম	নিম্ন-মধ্যম
৮	অতি নিম্ন-নিম্ন	নিম্ন	মধ্যম	নিম্ন	নিম্ন-মধ্যম
৯	অতি নিম্ন-নিম্ন	নিম্ন-মধ্যম	নিম্ন	নিম্ন-মধ্যম	নিম্ন-মধ্যম
১০	নিম্ন	নিম্ন-মধ্যম	মধ্যম	নিম্ন-মধ্যম	নিম্ন
১১	অতি নিম্ন-নিম্ন	নিম্ন-মধ্যম	মধ্যম	নিম্ন-মধ্যম	নিম্ন-মধ্যম
১২	অতি নিম্ন-নিম্ন	নিম্ন-মধ্যম	মধ্যম-পরিমিত	নিম্ন-মধ্যম	নিম্ন-মধ্যম
১৩	অতি নিম্ন-নিম্ন	অতি নিম্ন-নিম্ন	পরিমিত-উচ্চ	পরিমিত-উচ্চ	নিম্ন-মধ্যম
১৪	পরিমিত-উচ্চ	নিম্ন	পরিমিত	উচ্চ	নিম্ন
১৫	নিম্ন	নিম্ন-মধ্যম	মধ্যম-পরিমিত	মধ্যম-পরিমিত	মধ্যম
১৬	নিম্ন	নিম্ন-মধ্যম	নিম্ন	মধ্যম-পরিমিত	নিম্ন-মধ্যম
১৭	নিম্ন	নিম্ন-মধ্যম	নিম্ন-মধ্যম	নিম্ন-মধ্যম	মধ্যম-পরিমিত
১৮	অতি নিম্ন-নিম্ন	নিম্ন-মধ্যম	নিম্ন-মধ্যম	মধ্যম-পরিমিত	নিম্ন-মধ্যম
১৯	অতি নিম্ন-নিম্ন	নিম্ন-মধ্যম	মধ্যম-পরিমিত	নিম্ন-মধ্যম	নিম্ন-মধ্যম
২০	অতি নিম্ন-নিম্ন	নিম্ন	নিম্ন	নিম্ন-মধ্যম	মধ্যম
২১	নিম্ন	নিম্ন-মধ্যম	নিম্ন-মধ্যম	মধ্যম-পরিমিত	মধ্যম-পরিমিত
২২	অতি নিম্ন-নিম্ন	নিম্ন	নিম্ন	নিম্ন	মধ্যম
২৩	নিম্ন	অতি নিম্ন-নিম্ন	নিম্ন-মধ্যম	মধ্যম-পরিমিত	নিম্ন-মধ্যম
২৪	অতি নিম্ন-নিম্ন	অতি নিম্ন-নিম্ন	নিম্ন-মধ্যম	পরিমিত-উচ্চ	নিম্ন
২৫	অতি নিম্ন-নিম্ন	নিম্ন-মধ্যম	নিম্ন	নিম্ন-মধ্যম	নিম্ন-মধ্যম
২৬	অতি নিম্ন-নিম্ন	অতি নিম্ন-নিম্ন	নিম্ন	নিম্ন	নিম্ন-মধ্যম
২৭	অতি নিম্ন-নিম্ন	নিম্ন-মধ্যম	নিম্ন-মধ্যম	নিম্ন	নিম্ন-মধ্যম
২৮	অতি নিম্ন-নিম্ন	নিম্ন	নিম্ন	নিম্ন	নিম্ন-মধ্যম
২৯	অতি নিম্ন-নিম্ন	নিম্ন	নিম্ন-মধ্যম	নিম্ন-মধ্যম	নিম্ন-মধ্যম
৩০	অতি নিম্ন-নিম্ন	নিম্ন	নিম্ন	নিম্ন	নিম্ন-মধ্যম

সূত্র : এফআরজি, বিএআরসি ২০১২।

চিত্র ৬। বাংলাদেশের কৃষি-পরিবেশ অঞ্চল।

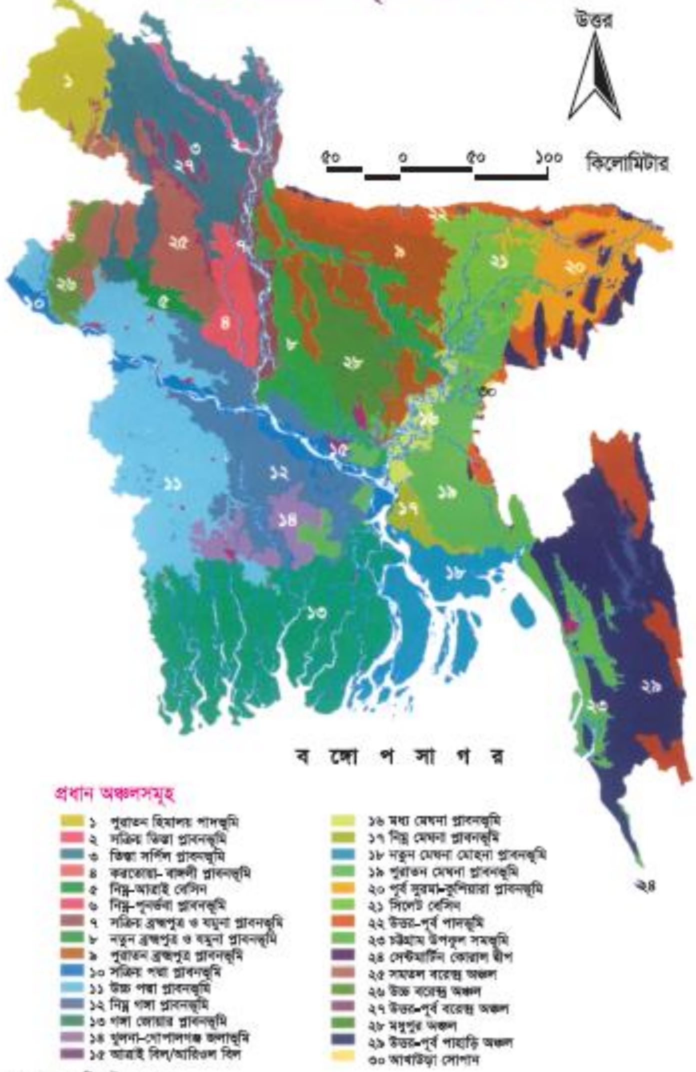

সূত্র: এসআরডিআই, ২০১০।

সারণী ৯। ফলন মাত্রা, মৌসুম ও মাটির উর্বরতা-ভিত্তিক সার প্রদানের সুপারিশ।

উর্বরতার শ্রেণী	প্রতি শতাংশে সারের পরিমাণ (গ্রাম)				
	ইউরিয়া	টিএসপি/ডিএপি	এমওপি	জিপসাম	জিঙ্ক সালফেট
		বোরো (ফলন মাত্রা ৭.৫ ± ০.৭৫ টন/হেক্টর)			
অতি নিম্ন	১৭৫০	৭০০	৮৪০	৪৭২	৭৫
অতি নিম্ন-নিম্ন	১৫০০	৬০০	৭২০	৪০৫	৬০
নিম্ন	১২৫০	৫০০	৬০০	৩৩৭	৪৫
নিম্ন-মাধ্যম	১০০০	৪০০	৪৮০	২৭০	৩০
মধ্যম	৭৫০	৩০০	৩৮০	২০২	১৫
মধ্যম-পরিমিত	৫০০	২০০	২৪০	১৩৫	-
		বোরো (ফলন মাত্রা ৬.০ ± ০.৬০ টন/হেক্টর)			
অতি নিম্ন	১৪০০	৪৯০	৭০০	৩১৫	৬২
অতি নিম্ন-নিম্ন	১২০০	৪২০	৬০০	২৭০	৫০
নিম্ন	১০০০	৩৫০	৫০০	২২৫	৩৭
নিম্ন-মাধ্যম	৮০০	২৮০	৪০০	১৮০	২৫
মধ্যম	৬০০	২১০	৩০০	১৩৫	১২
মধ্যম-পরিমিত	৪০০	১৪০	২০০	৯০	-
		রোপা আমন (ফলন মাত্রা ৫.০ ± ০.৫০ টন/হেক্টর)			
অতি নিম্ন	৯৪৫	৩৫০	৪৭২	৩১৫	৫০
অতি নিম্ন-নিম্ন	৮১০	৩০০	৪০৫	২৭০	৪০
নিম্ন	৬৭৫	২৫০	৩৩৭	২২৫	৩০
নিম্ন-মাধ্যম	৫৪০	২০০	২৭০	১৮০	২০
মধ্যম	৪০৫	১৫০	২০২	১৩৫	১০
মধ্যম-পরিমিত	২৭০	১০০	১৩৫	৯০	-
		রোপা আউশ (ফলন মাত্রা ৪.০ ± ০.৪০ টন/হেক্টর)			
অতি নিম্ন	৭৮৭	২৮০	৪২০	১৩১	৫০
অতি নিম্ন-নিম্ন	৬৭৫	২৪০	৩৬০	১৯৮	৪০
নিম্ন	৫৬২	২০০	৩০০	১৬৫	৩০
নিম্ন-মাধ্যম	৪৫০	১৬০	২৪০	১৩২	২০
মধ্যম	৩৩৭	১২০	১৮০	৯৯	১০
মধ্যম-পরিমিত	২২৫	৮০	১২০	৬৬	-

দ্রষ্টব্য : প্রতি কেজি ডিএপি সার ব্যবহারে ৪০০ গ্রাম ইউরিয়া সার কম প্রয়োগ করতে হবে। এসএসপি সার ব্যবহার করলে সারের মাত্রা ২.৫ গুণ বেশি হবে।

ভেজাল সার চেনার উপায়

কৃষি কাজে সার একটি অপরিহার্য উপকরণ। ব্যাপক চাহিদার কারণে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রায়ই অসাধু ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ভেজাল সার কিনে কৃষকরা প্রতারিত হন। তাই সার কেনার সময় ভেজাল সার চেনা দরকার। নিচে ভেজাল সার চেনার উপায় বর্ণনা দেয়া হলো।

ইউরিয়া

বাজারে ইউরিয়া সারের দাম অন্যান্য সারের চেয়ে কম। বর্তমানে ছোট সাদা দানা, অপেক্ষাকৃত বড় আকৃতির ধবধবে সাদা দানাদার এবং গুটি- এই তিন আকৃতির সার বাজারজাত হচ্ছে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, আসল ইউরিয়া সার কোনো অবস্থাতেই স্ফটিক আকৃতির হবে না। এ সার পানিতে গলে যায়। এ সার মেশানো পানি গ্লাসে নিলে কোন তলানি পড়ে না এবং পরিষ্কার দ্রবণ তৈরি করে। দ্রবণটির কাচের গ্লাস হাত দিয়ে স্পর্শ করলে ঠাণ্ডা অনুভব হয়। এক মুঠো শুকনো ইউরিয়ার দানা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ রাখার পর ছেড়ে দিলে হাতের তালু আঠালো অনুভব হয়।

টিএসপি

টিএসপি সার সাধারণত অম্ল/টক স্বাদযুক্ত এবং ঝাঁঝালো গন্ধ থাকে। একমুঠো টিএসপি সার নাকের কাছে নিয়ে শ্বাস গ্রহণ করলে তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ অনুভব হয়। এক চামচ টিএসপি সার আধা গ্লাস পানিতে মিশালে দ্রবীভূত হয়ে পরিষ্কার দ্রবণ তৈরি করবে। ভেজাল টিএসপি সার পানিতে ঘোলা দ্রবণ তৈরি করবে। টিএসপি সার পানিতে গলতে একটু সময় লাগে। তবে সম্পূর্ণরূপে গলে যায়। ভেজাল টিএসপি সার সম্পূর্ণরূপে গলে না। গ্লাসের নিচে তলানি পড়ে।

টিএসপি সার খুব শক্ত। তাই দুই আঙ্গুলের নখের মাঝে রেখে চাপ দিলে সহজে গুড়ো হবে না। ভেজাল টিএসপি সার একইভাবে নখের চাপ দিলে গুড়ো হয়ে যাবে এবং গুড়ো নানা রঙের হতে পারে।

ডিএপি

নাইট্রোজেনের মিশ্রণ থাকায় মানসম্মত ডিএপি সার কিছুক্ষণ শুকনো কাগজে বাতাসে রাখলে কাগজ ভিজে যাবে। কারণ ডিএপি সার বায়ুমণ্ডল থেকে আর্দ্রতা শোষণ করে। ভেজাল হলে সার বাতাস থেকে আর্দ্রতা শোষণ করবে না এবং কাগজও ভিজবে না।

এনপিকেএস মিশ্র সার

বাংলাদেশের মৃত্তিকা সম্পদের উর্বরতামান যথাযথ পর্যায়ে রাখার সহজ পদ্ধতি হিসেবে কয়েক বছর পূর্বে এনপিকেএস মিশ্র সারের প্রচলন করা হয়। বাংলাদেশ সরকার ফসলভেদে মোট ছয়টি গ্রেডের এনপিকেএস সারের বিনির্দেশ অনুমোদন করেছে। তবে বর্তমানে ধান ফসলের জন্য ৮-৮.৮-১১.৬২-৫ অনুপাতের মাত্র একটি গ্রেডের এনপিকেএস

মিশ্র সারই পাওয়া যায়। স্থানীয়ভাবে এনপিকেএস সার মূলত বাজারে প্রচলিত ইউরিয়া, ডিএপি অথবা টিএসপি, এমওপি ও জিপসাম সারের বিভিন্ন অনুপাতে ভৌত মিশ্রণের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়।

প্রকৃতি ও ধরন

- অধিকাংশ ক্ষেত্রে গুণগতমাণ বিবেচনায় না রেখে শুধু উৎপাদন খরচ কমিয়ে আনার জন্য সঠিক অনুপাতে সরল সারগুলো না মিশিয়ে কম অনুপাতে এ সকল সারের ভৌত মিশ্রণ ঘটানো হয়।
- এছাড়া ভেজাল হিসেবে মাটি ও ডলোমাইট ব্যবহার করে ভেজাল বা পুষ্টি উপাদান ঘাটতিযুক্ত এনপিকেএস মিশ্র সার প্রস্তুত করা হয়।
- অনেক ক্ষেত্রে শুধু মাটিতে রঙ মিশিয়ে যন্ত্রের সাহায্যে দানাদার আকার দিয়ে ভেজাল এনপিকেএস মিশ্র সার হিসেবে বাজারজাত করা হয়।
- বর্তমানে অধিকাংশ এনপিকেএস মিশ্র সারের নমুনায় কোন না কোন উপাদান যেমন- নাইট্রোজেন, ফসফেট, পটাশ অথবা গন্ধক নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে অনেক কম থাকায় ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ সার নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

শনাক্তকরণের পদ্ধতি

- এনপিকেএস মিশ্র সারের ভেজাল বিচিত্র ধরনের হওয়ায় মাঠ পর্যায়ে এ সারে ভেজালের মাত্রা ও প্রকৃতি নির্ণয় করা সহজ নয়। তবে মাটি বা ডলোমাইট দিয়ে কালো রঙের প্রলেপসহ ভেজাল এনপিকেএস মিশ্র সার তৈরি করা হলে তাতে আঙ্গুলের চাপে অতি সহজেই গুড়ো হয়ে যাবে। এছাড়া দানার ভিতর ও বাইরের প্রলেপের রঙ আলাদা হবে। মাটি দিয়ে তৈরি এনপিকেএস মিশ্র সার সহজে চিহ্নিত করা যায়।

এমওপি সার

বাংলাদেশে প্রচলিত পটাশ সারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মিউরিয়েট অব পটাশ বা এমওপি সার। এমওপি সারে ৫০% পটাশ (K) বিদ্যমান। এ সারের রঙ সাধারণত সাদা থেকে হালকা বা গাঢ় লালচে হয়ে থাকে। এ সার ছোট থেকে মাঝারি স্ফটিক আকৃতির হয়ে থাকে। এমওপি সারের ঝাঁঝালো গন্ধ বা স্বাদ নেই। বর্ষাকালে এমওপি সার খোলা অবস্থায় রেখে দিলে বাতাস থেকে আর্দ্রতা শোষণ করে ভিজে উঠবে এবং ক্রমান্বয়ে সারের নমুনায় আর্দ্রতার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

প্রকৃতি ও ধরন

স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এমওপি সারে ভেজাল হয়ে থাকে। ভেজাল এমওপি সারের ধরন ও প্রকৃতি সম্পর্কে নিচে কিছু ধারণা দেয়া হলো :

- এমওপি সারের সাথে সাদা মিহি ও মোটা বালি লাল রঙ করে মিশিয়ে ভেজাল এমওপি সার তৈরি করা হয়ে থাকে।

- এমওপি সারের সাথে আংশিক কাচের গুঁড়ো মিশিয়ে ভেজাল এমওপি সার তৈরি করা হয়ে থাকে।
- কখনো কখনো সামান্য পরিমাণে এমওপি সারের সাথে খাবার লবণ মিশিয়ে লাল রঙ করে ভেজাল এমওপি সার তৈরি করে বাজারজাত করা হয়।
- ম্যাগনেশিয়াম সালফেট সারে লাল রঙ মিশিয়ে ভেজাল এমওপি সার তৈরি করা হয়।

শনাক্তকরণের পদ্ধতি

- আধা চা চামচ এমওপি সার আধা গ্লাস পানিতে মেশালে সঠিক এমওপি সার সম্পূর্ণ দ্রবীভূত হয়ে হালকা লালচে দ্রবণ তৈরি করবে।
- সারের নমুনায় কিছু অদ্রবণীয় বস্তু যেমন– বালি, কাচের গুড়ো, মিহি সাদা পাথর, ইটের গুড়ো ইত্যাদি মেশালে তা তলানি আকারে গ্লাসের নিচে জমা হবে।
- সারের নমুনায় লাল বা অন্য কোন রঙ মেশালে পানির রঙ সেরকম হবে এবং রঙ ভেসে উঠবে। এছাড়া হাতে রঙ লেগে যাবে। সঠিক এমওপি সারের রঙ কখনো হাতে লেগে যাবে না।

সূত্র : ভেজাল সার বিষয়ক তথ্যাদি এসআরডিআই থেকে সংগৃহীত ও পরিমার্জিত।

আগাছা দমন

আগাছা ধানগাছের সাথে আলো, পানি ও খাদ্য উপাদানের জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। প্রতিকূল পরিবেশে আগাছা সহজে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং ধানগাছের চেয়ে অধিক হারে বাড়তে পারে। এ জন্য আগাছার বৃদ্ধি অনেক বেশি হয়। ফলে ধানগাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং ফলন কমে যায়। তাছাড়া আগাছা পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের আশ্রয়স্থল হিসেবে পরোক্ষভাবেও ধানের ক্ষতি করে থাকে। সাধারণত আমন ও বোরো মৌসুমের চেয়ে আউশ মৌসুমে, বিশেষ করে বোনা আউশে আগাছার উপদ্রব বেশি হয়। আউশ মৌসুমের প্রথম বৃষ্টিপাতের পর জমিতে দু'একটি চাষ দিয়ে পতিত অবস্থায় রেখে দিলে আগাছার বীজ গজিয়ে ওঠে। কিছুদিন পর পুনরায় মই দিয়ে ধান বপন করলে আগাছার উপদ্রব অনেকাংশে কমে যায়। রোপা জমিতে ৫-১০ সেন্টিমিটার পানি রাখলে জমিতে আগাছা কম জন্মায়।

বিভিন্ন ধানের জাত ও মৌসুমভেদে আগাছার সাথে ধানগাছের প্রতিযোগিতার ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। আউশ ও আমন মৌসুমের জন্য ৩০-৪০ দিন এবং বোরো মৌসুমের জন্য ৪০-৫০ দিন জমি আগাছামুক্ত রাখা উচিত। কারণ এ সময়ে আগাছা দমন না করলে যে ক্ষতি হয় পরে সারা মৌসুমে ওই জমি আগাছামুক্ত রেখেও তা পূরণ করা যায় না।

হাত দিয়ে, নিড়ানি যন্ত্রের সাহায্যে, আগাছানাশক ব্যবহার করে এবং জৈবিক পদ্ধতিতে আগাছা দমন করা যায়। হাত দিয়ে আগাছা দমন অপেক্ষাকৃত সহজ। রোপা ধানে কমপক্ষে দু'বার আগাছা দমন করতে হয়। প্রথমবার ধান লাগানোর ১৫ দিন পর এবং পরের বার ৩০-৩৫ দিন পর। যদি আউশ বা আমন মৌসুমে জমি শুকিয়ে যায় বা বোরো মৌসুমে সেচ দিতে দেরি হয় তাহলে আগাছার পরিমাণ বেড়ে যায় এবং তখন আরেকটি হাত নিড়ানির প্রয়োজন পড়ে। এ পদ্ধতিতে আগাছা দমনে শ্রমিক, সময় ও খরচ বেশি লাগে।

নিড়ানি যন্ত্র ব্যবহারে ধানের দু'সারির মাঝের আগাছা দমন হয়। কিন্তু দু'গুছির ফাঁকে যে আগাছা থাকে তা হাত দিয়ে তুলতে হবে। আগাছা তুলে মাটির ভিতর পুঁতে দিলে তা পচে জৈব সারের কাজ করে। ব্রি উইডার নামের নিড়ানি যন্ত্র দিয়ে ঘণ্টায় ১০ শতাংশ জমির আগাছা দমন করা যায়। যন্ত্রটির আনুমানিক মূল্য ৪৫০ টাকা। এটি ব্যবহার করা সহজ ও ওজনে হালকা। ফলে নারী শ্রমিকরাও সহজেই এটি ব্যবহার করতে পারেন।

আগাছানাশক ব্যবহার

আগাছানাশক ব্যবহার করে সহজেই আগাছা দমন করা যায়। অধিকতর কার্যকর ও সাশ্রয়ী হওয়ায় এ পদ্ধতি ক্রমেই জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। আগাছানাশক ব্যবহারে কম সময়ে এবং কম খরচে বেশি পরিমাণ জমির আগাছা দমন করা যায়। তরল, দানাদার ও পাউডার- এ তিন ধরনের আগাছানাশক বাজারে পাওয়া যায়। এর মধ্যে তরল ও পাউডার জাতীয় আগাছানাশক নির্দিষ্ট পরিমাণ পানির সাথে মিশিয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে স্প্রে মেশিন দিয়ে ছিটাতে হয় এবং দানাদার আগাছানাশক সারের মতো জমিতে ছিটিয়ে ব্যবহার করা যায়। প্রি-ইমারজেন্স আগাছানাশক ধান লাগানোর ৩–৬ দিনের মধ্যে এবং পোস্ট-ইমারজেন্স আগাছানাশক আগাছার বৃদ্ধি ও মৌসুমভেদে রোপণের/বপনের ১০-১৫ দিনের মধ্যে ব্যবহার করতে হয়। জমিতে কখন এটি ব্যবহার করতে হবে তা নির্ভর করে আগাছানাশকের উপাদানের উপর (সারণী ১০)। তবে পরিবেশের উপর আগাছানাশকের প্রভাব বিবেচনায় রেখে যৌক্তিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা উচিত।

ধান রোপণের/বপনের ৩–৬ দিনের মধ্যে জমিতে ১-৩ সেন্টিমিটার পানি থাকা অবস্থায় প্রি-ইমারজেন্স আগাছানাশক, যেমন রিফিট ৫০০ ইসি, সুপারহিট ৫০০ ইসি, সুপারক্লিন ৫৩% ডব্লিউপি, ভ্যানিস ১৮ ডব্লিউপি, এইমক্লোর ৫ জি, একটিভার ২৫ ইসি ইত্যাদি প্রয়োগ করতে হয়। আর্লি পোস্ট-ইমারজেন্স আগাছনাশক জমিতে আগাছার বৃদ্ধি ১-২ পাতা বিশিষ্ট হলেই ব্যবহার করা যায়। যেমন, সানরাইজ ১৫০ ডব্লিওপি, সিরিয়াস ১০ ডব্লিওপি ও সাথী ১০ ডব্লিওপি। নাবি বা লেট পোস্ট-ইমারজেন্স আগাছানাশক আগাছা যখন বড় হয়ে যায়, অর্থাৎ আগাছা যখন ৩-৫ পাতা বিশিষ্ট হয় তখন ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ ২–৪, ডি অ্যামাইন; এমসিপিএ ৫০০ ইসি ও এগ্রোজন। উল্লিখিত বিভিন্ন উপাদানের আগাছানাশক রোপণকৃত জমিতে প্রয়োগ করার পর সাধারণত আর আগাছা পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু প্রয়োগকৃত জমিতে আগাছার পরিমাণ বেশি হলে রোপণের ৩০-৪৫ দিন পর একবার হালকা হাত নিড়ানির প্রয়োজন পড়ে।

জৈবিক পদ্ধতি : ভক্ষণকারী জীব, পোকা-মাকড়, ছত্রাক ও পরজীবীর মাধ্যমে পরিবেশের কোন ক্ষতি না করে কোন স্থানের আগাছা দমন করাই হচ্ছে জৈবিক আগাছা দমন পদ্ধতি। কিছু কিছু অঞ্চলে সমন্বিত ধান-হাঁস পদ্ধতি ব্যবহার করে জৈবিক আগাছা দমন করা সম্ভব হয়েছে। ধান-হাঁস চাষ পদ্ধতিতে জমি তৈরির সময় বিঘা প্রতি ২০–২৫ মণ গোবর সার মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। ধানের চারা রোপণের ৭-১৪ দিন পর ২০–২৫ দিন বয়সের হাঁসের বাচ্চা সারি করে লাগানো ধান ক্ষেতে অবমুক্ত করতে হয়

সারণী ১০। বাংলাদেশে অনুমোদিত কিছু আগাছানাশক ও এর কার্যকারিতার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।

কার্যকর উপাদান	আগাছানাশক	প্রয়োগের সময়	মাত্রা (প্রতি বিঘায়)	আগাছার গ্রুপ
২-৪ ডি	২-৪ ডি, অ্যামাইন	আগাছার ৩-৫ পাতা জন্মানো পর্যন্ত	৪৬০ মিলি	বড় পাতা, সেজ জাতীয় আগাছা
বুটাক্লোর	এমকোবুটা ৫ জি, বুটাকিল ৫ জি, নোক্লোর ৫ জি, ম্যাচেটি ৫জি, এইমক্লোর ৫ জি, সুপারকিল ৫ জি সহ এ গ্রুপের অন্যান্য আগাছানাশক	রোপণের/বপনের ৩-৬ দিন পর্যন্ত	৩-৩.৪৬ কেজি	বড় পাতা, ঘাস ও সেজ আগাছা
এমসিপিএ	এমসিপিএ ৫০০ ইসি	আগাছার ৩-৫ পাতা জন্মানো পর্যন্ত	১৪ মিলি	বড় পাতা, ঘাস ও সেজ আগাছা
অক্সাডায়াজন	করস্টার ২৫ ইসি, অ্যামকোস্টার ২৫ ইসি, মিরাকল ২৫ ইসি, অক্সাস্টার ২৫ ইসি	রোপণের/বপনের ৩-৬ দিন পর্যন্ত	২৬৮ মিলি	বড় পাতা, ঘাস ও সেজ আগাছা
প্রিটাইলাক্লোর	রিফিট ৫০০ ইসি, সুপারহিট ৫০০ ইসি, ক্লিয়ার ৫০০ ইসি, কমিট ৫০০ ইসি, টপ ৫০০ ইসি, অ্যামকোফিট ৫০০ ইসি সহ এ গ্রুপের অন্যান্য আগাছানাশক	রোপণের/বপনের ৩-৬ দিন পর্যন্ত	১৩৪ মিলি	বড় পাতা, কিছু ঘাস ও সেজ আগাছা
মেফেনেসেট+ বেনসালফিউরান মিথাইল	সুপারক্লিন ৫৩% ডব্লিওপি, বিলিফ ৫৩% ডব্লিওপি সহ এ গ্রুপের অন্যান্য আগাছানাশক	রোপণের/বপনের ৩-৬ দিন পর্যন্ত	১৪৮ গ্রাম	ঘাস, সেজ ও বড় পাতা আগাছা
পাইরাজোসাল-ফিউরান ইথাইল	সরিয়াস ১০ ডব্লিওপি, সাথী ১০ ডব্লিওপি, পপ ১০ ডব্লিওপি সহ এ গ্রুপের অন্যান্য আগাছানাশক	আগাছার ১-২ পাতা জন্মানো পর্যন্ত	২০ গ্রাম	বড় পাতা ও ঘাস আগাছা
ইথক্সিসালফি-উরান	সানরাইজ ১৫০ ডব্লিওপি	আগাছার ১-২ পাতা জন্মানো পর্যন্ত	১৪ গ্রাম	বড় পাতা ও ঘাস আগাছা
পেন্ডামিথাইলিন	প্যানিডা ৩৩ ইসি, ডিপেণ্ড ৩০ ইসি	বপন/রোপণের ২-৪ দিন পর্যন্ত, জমি শুকনো বা হালকা ভেজা	৩৩৪ মিলি	বড় পাতা ও ঘাস আগাছা
অক্সাডায়ারজিল	টপস্টার ৪০০ এসসি	রোপণের ৩-৬ দিন পর্যন্ত, জমির পানি শুকিয়ে স্প্রে	২৫ মিলি	ঘাস, সেজ ও বড় পাতা আগাছা
পাইরাজোসাল-ফিউরান ইথাইল ০.৬%+ প্রিটাইলাক্লোর ৩৪.৪%	রিমোভার ৩৫ ডব্লিওপি, পপগোল্ড ৩৫ ডব্লিওপি, ভ্যানিস ৩৫ ডব্লিওপি সহ এ গ্রুপের অন্যান্য আগাছানাশক	আগাছা ১-২ পাতা জন্মানো পর্যন্ত	১০৭ গ্রাম	ঘাস, বড় পাতা, সেজ জাতীয় আগাছা

সারণী ১০। ক্রমশ।

কার্যকর উপাদান	আগাছানাশক	প্রয়োগের সময়	মাত্রা (প্রতি বিঘায়)	আগাছার গ্রুপ
বেনসালফিউরান মিথাইল+ এসিটাক্লোর	নিরমুল ১৮ ডব্লিওপি, কিলিক ১৮ ডব্লিওপি, ভ্যানিস ১৮ ডব্লিওপি, ফোবেক্স ১৮ ডব্লিওপি	রোপণের/বপনের ৩–৬ দিন পর্যন্ত	৬৬ গ্রাম	ঘাস, বড় পাতা, সেজ জাতীয় আগাছা
ফেনোক্সাপ্রপি ইথাইল	একুরেটর ৬৯ ডব্লিওপি	আগাছার ১–২ পাতা জন্মানো পর্যন্ত	৬৭ মিলি	ঘাস, বড় পাতা, সেজ জাতীয় আগাছা
বিসপাইরিবেক সোডিয়াম	ম্যাট্রিক্স ২০ ডব্লিওপি, ডিমাশু ২০ ডব্লিওপি	আগাছার ১–২ পাতা জন্মানো পর্যন্ত	২০ গ্রাম	ঘাস ও বড় পাতা
বিসপাইরিবেক সোডিয়াম + বেনসালফিউরান মিলাইল	ম্যানিন ৩০০ ডব্লিওপি, পুলক ৩০ ডব্লিওপি	আগাছার ১–২ পাতা জন্মানো পর্যন্ত	১৯ গ্রাম	ঘাস, বড় পাতা ও সেজ

এবং ধানে ফুল আসার আগে ধানক্ষেত থেকে হাঁস উঠিয়ে নিতে হয়। এ পদ্ধতিতে প্রতি বিঘা জমিতে ৪০–৪৫টি হাঁসের বাচ্চার প্রয়োজন।

হাঁস কার্যকরভাবে ধানের আগাছা খেয়ে তা ধ্বংস করে এবং কীটপতঙ্গ খেয়ে তাদের দমন করে। হাঁসের বিষ্ঠা জমিতে জৈব সারের কাজ করে। এ পদ্ধতিতে আগাছা দমন করলে, কীটনাশক প্রয়োগ ও রাসায়নিক সারের প্রয়োজন হয় না, ফলে ধান চাষে খরচ কমে যায় এবং কৃষক একই সাথে ধান, হাঁস ও ডিম উৎপাদন করতে পারেন।

সমন্বিত ব্যবস্থাপনা : একাধিক আগাছা দমন পদ্ধতির সমন্বয়ে পরিবেশের ক্ষতি সর্বনিম্নে রেখে আগাছা ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিকে সমন্বিত আগাছা দমন পদ্ধতি বলে। শুধু হাত, নিড়ানি যন্ত্র বা আগাছানাশক দিয়ে যতটুকু আগাছা দমন করা সম্ভব তার চেয়ে বেশি কার্যকর সমন্বিত পদ্ধতি। আগাছা দমনে নির্দিষ্ট একটি পদ্ধতি ততটা কার্যকর না হওয়াই স্বাভাবিক। যখন যেখানে যে পদ্ধতি প্রয়োগ করার উপযোগী এবং অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক সেখানে সেই পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত। এ কারণে সমন্বিত পদ্ধতিতে আগাছা দমন বর্তমানে খুব গুরুত্ব পাচ্ছে। সমন্বিত আগাছা ব্যবস্থাপনার উল্লেখযোগ্য কিছু দিক হলো–

- আগাছামুক্ত পরিষ্কার বীজ ব্যবহার করতে হবে, তাহলে আগাছার পরিমাণ কম হবে।
- জমি ভালভাবে প্রস্তুত করলে আগাছার পরিমাণ কম হবে।
- জমিতে অনেক সময় আগাছানাশক ছিটানোর পরও কিছু আগাছা থেকে যায়। এক্ষেত্রে একবার নিড়ানি দিয়ে জমি আগাছামুক্ত করা যায়।
- ব্রি উইডার দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে জমিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি রাখলে আগাছার পরিমাণ কম হয়।

সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা

ধানের জমিতে সব সময় দাঁড়ানো পানি রাখার প্রয়োজন নেই। ধানের চারা রোপণের পর জমিতে ১০-১২ দিন পর্যন্ত ছিপছিপে পানি রাখতে হবে, যাতে রোপণকৃত চারায় সহজে নতুন শিকড় গজাতে পারে। এরপর কম পানি রাখলেও চলবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ধানগাছ যেন পানির স্বল্পতায় না পড়ে। বৃষ্টি-নির্ভর রোপা আমন এলাকায় জমির আইল ১৫ সেন্টিমিটার উঁচু রাখলে অনেকাংশে বৃষ্টির পানি ধরে রাখা যায়, যা খরা থেকে ফসলকে কিছুটা হলেও রক্ষা করে। এরপরও যদি ফসল খরা কবলিত হয় তাহলে প্রয়োজন মাফিক সম্পূরক সেচ দিতে হবে। গবেষণায় দেখা গেছে, খরা কবলিত ধানের চেয়ে সম্পূরক সেচযুক্ত ধানের ফলন হেক্টরে প্রায় এক টন বেশি হয়।

বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে রবি ফসল উৎপাদন

ব্রির সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ উপকূলীয় এলাকায় বৃষ্টির পানি পুকুরে সংরক্ষণ করে সফলভাবে রবি ফসল উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে। দেখা গেছে, রবি মৌসুমের শুরুতে পুকুরের ৮০ ভাগ পানি দ্বারা পূর্ণ থাকে। রবি ফসলে তিনটি সেচ দেয়া সম্ভব হয়। এ ক্ষেত্রে জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় (চিত্র ৭)। এ ক্ষেত্রে ধান ব্যতীত অন্যান্য ফসল যেমন সবজি, সরিষা, সূর্যমুখী চাষ করা যায়।

চিত্র ৭। উপকূলীয় অঞ্চলে একটি আদর্শ ফার্ম রিজার্ভার।

অগভীর নলকূপে চেক ভাল্ব সংযোজনের মাধ্যমে প্রাইমিং সমস্যা দূরীকরণ

বাংলাদেশের মোট সেচকৃত জমির শতকরা ৮০ ভাগে সেচ প্রদান করা হয় অগভীর নলকূপের মাধ্যমে। বর্তমানে প্রায় ১২ লক্ষ অগভীর নলকূপ সেচ কাজে নিয়োজিত আছে। ভবিষ্যতে সেচ এলাকা বৃদ্ধির সাথে সাথে অগভীর নলকূপের সংখ্যাও বাড়বে। অগভীর নলকূপের পাম্প চালানোর সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো প্রাইমিং। অগভীর নলকূপের পাম্প যখনই চালু করা হয় তখনই প্রাইমিং এর প্রয়োজন হয়। প্রাইমিং কাজটি অত্যন্ত বিরক্তিকর এবং এ কাজের জন্য সময় অপচয় ও অতিরিক্ত শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। ফলে অগভীর নলকূপের মালিককে পাম্প ড্রাইভারের বেতন ছাড়াও অতিরিক্ত টাকা খরচ করতে হয়। তাছাড়া বিরক্তিকর প্রাইমিং এড়ানোর জন্য পাম্পের মালিক দিনে মাত্র ২-৩ বার পাম্প চালায়। ফলে কৃষকগণ জমিতে সেচ দেয়ার জন্য সময়মত পানি পায় না। বার বার প্রাইমিং এর বিড়ম্বনা দূর করার জন্য বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা

বিভাগ একটি চেক ভাল্ব প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে (চিত্র ৮)। এই চেক ভাল্ব ব্যবহার করলে মৌসুমের শুরুতে একবার প্রাইমিং করলে সারা মৌসুমে আর প্রাইমিং এর প্রয়োজন হবে না।

চিত্র ৮। অগভীর নলকূপে চেক ভাল্বের ব্যবহার।

প্রযুক্তির সুবিধা: এ প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য বিশেষ কোন কারিগরি দক্ষতার প্রয়োজন নেই। অতি সহজেই চেক ভাল্বটি অগভীর নলকূপের সাথে সংযোজন করা যায়। এটি সহজে বহনযোগ্য। যে কোন স্থানীয় ওয়ার্কশপে এটি তৈরি করা যায়। সেচ মৌসুম শেষে চেকভাল্ব খুলে বাড়িতে রাখা যায়। এ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে মৌসুমের শুরুতে এক বারই প্রাইমিং করতে হয়। পুরো মৌসুমে আর প্রাইমিং এর প্রয়োজন হয় না। সুতরাং পাম্প চালানোর জন্য শুধু সুইচ (বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে) টিপ দেওয়া এবং হাতল (ডিজেল চালিত ক্ষেত্রে) ঘুরানোই যথেষ্ট। এর রক্ষণাবেক্ষণ খরচ নাই বললেই চলে। তবে ৮-১০ বছর পর পর রাবারের ভাল্বটি নতুন করে লাগাতে হবে। চেক ভাল্ব ছাড়া অগভীর নলকূপের অপারেটর একজন কৃষকের জমিতে পানি সরবরাহের জন্য পাম্প চালাতে অনীহা প্রকাশ করে; তবে সে ৭-৮ জন কৃষকের চাহিদাকে একত্র করে পাম্প চালাতে আগ্রহী। অথচ চেক ভাল্ব যুক্ত অগভীর নলকূপ অপারেটর যে কোন সময় একজন কৃষকের চাহিদা মিটাতে অনীহা প্রকাশ করে না। কারণ চেক ভাল্ব লাগানোর ফলে পাম্প চালাতে প্রাইমিং এর প্রয়োজন পড়ে না। তাই কৃষকের সময়মত এবং প্রয়োজনমত পানি পেতে অসুবিধা হয় না।

অসুবিধা: সেটিং ঠিকমত না হলে চেক ভাল্ব ঠিকমত কাজ করে না।

আর্থিক সাশ্রয়: চেক ভাল্ব ব্যবহারের ফলে যে শুধু অগভীর নলকূপের প্রাইমিং সমস্যার সমাধানসহ কৃষকের নলকূপ চালানোর কষ্ট লাঘব করা যায় তা নয়, এর ফলে অগভীর নলকূপে প্লাস্টিক পাইপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে। পাম্প চালানোর জন্য মৌসুমে একবার প্রাইমিং প্রয়োজন। পাম্প চালাতে অতিরিক্ত শ্রমিকের খরচ লাগে না। পাম্প মালিকের প্রতি মৌসুমে ৯,০০০ টাকা সাশ্রয় হয়।

গভীর নলকূপে পিভিসি পাইপের মাধ্যমে পানি বিতরণ পদ্ধতি

বাংলাদেশে সেচকৃত জমির পরিমাণ আবাদি জমির শতকরা ৫৫ ভাগ। সেচকৃত জমির শতকরা ১৫ ভাগে ভূ-উপরিস্থ পানি এবং শতকরা ৮৫ ভাগে ভূগর্ভস্থ পানি দ্বারা সেচ প্রদান করা হয়। ভূ-উপরিস্থ পানি প্রদানের জন্য লো লিফ্‌ট পাম্প ও বিভিন্ন প্রকার বাঁধ (ড্যাম) ব্যবহার করা হয়। আবার ভূগর্ভস্থ পানি প্রদানের জন্য গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ, সাবমার্সিবল পাম্প ইত্যাদি সেচ যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে দেশে প্রায় ৬৬ হাজার গভীর নলকূপ এবং ১২ লক্ষ অগভীর নলকূপ সেচ কাজে নিয়োজিত আছে। এ ধরনের সেচ যন্ত্রে পানি উত্তোলন এবং ডিসচার্জ ক্ষমতা সন্তোষজনক থাকলেও মাঠে পানি বন্টনের পদ্ধতি

অনেক ক্ষেত্রে সন্তোষজনক হয় না। বিশেষ করে গভীর নলকূপের ক্ষেত্রে যখন কাঁচা, আধা পাকা, ভাঙ্গা পাকা নালার মাধ্যমে মাঠে পানি বন্টন করা হয় তখন সরবরাহকৃত পানির শতকরা ২৫-৩০ ভাগ অপচয় হয় শুধু নালাতেই, যাকে বড় ধরনের পরিবহন অপচয় বলা যায়। আবার যে সকল জমির উচ্চতা পানির উৎস থেকে উপরে অবস্থিত সে সকল জমিতে উল্লিখিত পদ্ধতিতে পানি পৌছানো সম্ভব হয় না। এমনকি জমি সমতল হলেও প্রান্তিক জমিতে চাহিদা মতো পানি দেয়া সম্ভব হয় না। এসব অসুবিধার কারণে এ পদ্ধতিতে পানি বিতরণের ফলে কাঙ্ক্ষিত জমির তুলনায় অনেক কম জমিতে সেচ প্রদান করা হয়। সুতরাং, যত্রতত্র অনিয়মতান্ত্রিক সেচ যন্ত্র না বসিয়ে শুধু উন্নতমানের সেচ বিতরণ ব্যবস্থা বা প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পানি ব্যবহারের দক্ষতা বাড়িয়ে সেচ এলাকা বৃদ্ধি সম্ভব। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ গভীর নলকূপে পিভিসি পাইপের মাধ্যমে পানি বিতরণ পদ্ধতি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে (চিত্র ৯)। এ পদ্ধতিতে পানি সাশ্রয়ের মাধ্যমে সেচ এলাকা বৃদ্ধি ও সেচ খরচ কমানো সম্ভব।

চিত্র ৯। পিভিসি পাইপের মাধ্যমে পানি বিতরণ।

সুবিধা: এ প্রযুক্তিতে পানি পরিবহন অপচয় প্রায় শূন্য। অতি দ্রুত উৎস থেকে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পানি পৌছে, ফলে কাঁচা নালার তুলনায় শতকরা ৩১.৬ ভাগ সময় সাশ্রয় হয়। উঁচ-নিচু জমিতে সহজেই পানি বিতরণ সম্ভব। উৎস থেকে উঁচু জমিতেও পানি সরবরাহ করা যায়। তাছাড়া প্রধান অথবা শাখা নালা ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে কিংবা খাল ও নর্দমার উপর দিয়ে স্থাপন করা যায়। পানি ব্যবহার দক্ষতা বৃদ্ধি ও অপচয় রোধের মাধ্যমে পানি সাশ্রয়ের ফলে সেচ এলাকা বৃদ্ধি করা (শতকরা ৩০ ভাগ বা তার বেশি) সম্ভব। প্রযুক্তিটির রক্ষণাবেক্ষণ খরচ খুবই কম।

আর্থিক সাশ্রয়: অন্যান্য উন্নত পানি বিতরণ ব্যবস্থা যেমন- বারিড পাইপ সিস্টেম, পাকা নালা ইত্যাদির চেয়ে এ পদ্ধতির খরচ (প্রতি মিটারে) কম। যেখানে সেচের ট্যাক্স প্রিপেইড পদ্ধতিতে হয় সেখানে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করলে সেচের খরচ কাঁচা নালা বিতরণ পদ্ধতির চেয়ে অনেক কমে যাবে। এ পদ্ধতিতে কাঁচা নালার তুলনায় প্রতি হেক্টরে সেচ খরচ কমিয়ে প্রায় ৩,৫০০ টাকা সাশ্রয় করা সম্ভব হয়।

এডব্লিউডি পদ্ধতি

বোরো মৌসুমে ধান আবাদে পানি সাশ্রয়ী আর একটি পদ্ধতির নাম অলটারনেট ওয়েটিং এন্ড ড্রায়িং বা এডব্লিউডি। এ পদ্ধতির জন্য প্রয়োজন হয় একটি ৭-১০ সেন্টিমিটার ব্যাস ও ২৫ সেন্টিমিটার লম্বা ছিদ্রযুক্ত পিভিসি পাইপ বা চোঙ্গ (চিত্র ১০)। এটি চারা রোপণের ১০-১৫

দিনের মধ্যে জমিতে চারটি ধানের গোছার মাঝে খাড়াভাবে স্থাপন করতে হবে যেন এর ছিদ্রবিহীন ১০ সেন্টিমিটার মাটির উপরে এবং ছিদ্রযুক্ত ১৫ সেন্টিমিটার মাটির নিচে থাকে (চিত্র ১০)। এবার পাইপের তলা পর্যন্ত ভিতর থেকে মাটি উঠিয়ে নিতে হবে। মাটি শক্ত হলে গর্ত করে পাইপটি মাটিতে বসানো যেতে পারে। যখন পানির স্তর পাইপের তলায় নেমে যাবে তখন জমিতে এমনভাবে সেচ দিতে হবে যেন দাঁড়ানো পানির পরিমাণ ৫-৭ সেন্টিমিটার হয়। আবার ক্ষেতের দাঁড়ানো পানি শুকিয়ে পাইপের তলায় নেমে গেলে পুনরায় সেচ দিতে হবে (চিত্র ১১)। এভাবে পর্যায়ক্রমে ভিজানো ও শুকানো পদ্ধতিতে সেচ চলবে জাতভেদে ৪০-৫০ দিন পর্যন্ত। যখনই গাছে থোড় দেখা দেবে তখন থেকে দানা শক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ক্ষেতে স্বাভাবিক ২-৫ সেন্টিমিটার পানি রাখতে হবে। দেখা গেছে, এডব্লিউডি পদ্ধতিতে বোরো ধানে সেচ দিলে দাঁড়ানো পানি রাখার চেয়ে ৪-৫টি সেচ কম লাগে এবং ফলনও কমে না। ফলে সেচের পানি, জ্বালানি ও সময় সাশ্রয় হয় এবং উৎপাদন খরচও হ্রাস পায়।

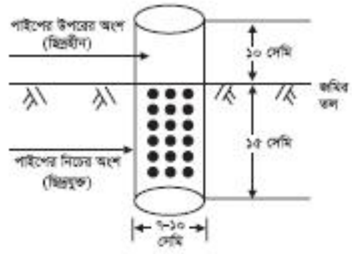

চিত্র ১০। এডব্লিউডি পাইপ তৈরি এবং স্থাপন পদ্ধতি।

চিত্র ১১। এডব্লিউডি পদ্ধতিতে পাইপে পানি পর্যবেক্ষণ।

সেচ খরচ

বোরো মৌসুমে ধান চাষাবাদে খরচের অন্যতম প্রধান খাত হলো সেচ। ২০০৩ সাল পর্যন্ত সেচ খরচ খুবই অল্প হারে বেড়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে জ্বালানি তেল, বিদ্যুৎ, সেচ যন্ত্রপাতি ও শ্রমিকের খরচ বেড়ে যাওয়ায় সেচ খরচ দ্রুত বেড়েছে। বৃদ্ধির এ হার বজায় থাকলে আগামী ২০৩১ সালে প্রতি হেক্টরে সেচ খরচ ১৬,৭১২ টাকায় দাঁড়াবে। কাজেই উৎপাদন খরচ কম রাখতে হলে মাঠ পর্যায়ে সেচ ব্যবস্থাপনা এবং সেচ প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে খরচ সীমিত করতে হবে।

ধান চাষে ড্রাম সিডার

প্লাস্টিকের তৈরি ছয়টি ড্রাম বিশিষ্ট বীজ বপন যন্ত্র ড্রাম সিডার (চিত্র ১২)। এটি কাদাময় জমিতে সারি করে সরাসরি বীজ বপন করে ধান চাষাবাদের একটি প্রযুক্তি। এ পদ্ধতিতে বীজতলা তৈরি, চারা উত্তোলন ও রোপণ করতে হয় না। তাই সময়, শ্রম ও উৎপাদন ব্যয়

বহুলাংশে কমানো যায়। এ পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে ফসল রোপা পদ্ধতির চেয়ে ১০-১৫ দিন আগে পাকে। ড্রাম সিডার ব্যবহারের জন্য জমি উত্তমরূপে চাষ ও মই দিয়ে কাদাময় করে নিতে হবে। এবার জমিকে যথাসম্ভব সমতল করতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে যেন কোথায়ও পানি দাঁড়িয়ে না থাকে। ভাল বীজ ২৪ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে ২-৩ দিন জাগ দিয়ে ভালভাবে অঙ্কুরিত করে নিতে হবে যেন অঙ্কুরের দৈর্ঘ্য ৪-৫ মিলিমিটার বা একটি ধানের সমান লম্বা হয়। ড্রামে বীজ ভরার আগে অঙ্কুরিত বীজ ১-২ ঘণ্টা ছায়ায় ছড়িয়ে দিয়ে বাতাসে শুকিয়ে নিলে ভাল হয়। উক্ত বীজ ড্রামের এক-তৃতীয়াংশ খালি রেখে ভরতে হবে। ড্রামের গায়ে আঁকা ত্রিভুজাকৃতি চিহ্ন যেন সবসময় সামনের দিকে থাকে। এবার হাতল ধরে সামনে চলতে থাকলে ছয়টি ড্রাম থেকে ১২ লাইনে বীজ বপন হতে থাকবে (চিত্র ১২)। হাতলের সাথে ২-৩ ফুট লম্বা চিকন এক খণ্ড কলা গাছ বেঁধে নিলে (হালকা মই হিসেবে) জমিতে পায়ের দাগ বা গর্ত মুছে যাবে।

চিত্র ১২। ড্রাম সিডারের সাহায্যে ধান চাষ।

বোরো মৌসুমে ১৫ নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাসের প্রথম (অগ্রহায়ণের তৃতীয়) সপ্তাহ পর্যন্ত বীজ বপন করতে হবে। আমন মৌসুমে পানি নিষ্কাশনের সুযোগ আছে এমন মাঝারি উঁচু জমিতে জুলাইয়ের প্রথম (আষাঢ়ের তৃতীয়) সপ্তাহে বীজ বোনা যায়। তবে বীজ বপনের অন্তত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই এমন সময় বেছে নিতে হবে। কারণ বপনের পর পর ভারী বৃষ্টি হলে বীজের সারি ও বীজ এলোমেলো হয়ে যেতে পারে।

বপনের প্রথম ৪-৫ দিন জমিতে পানির প্রয়োজন নেই। মাটি ভেজা থাকলেই যথেষ্ট। পরে গাছের বৃদ্ধির সাথে খাপ খাইয়ে প্রথমে ছিপছিপে পানি এবং কিছুটা বড় হয়ে গেলে রোপা পদ্ধতির অনুরূপ পানি ব্যবস্থাপনা করতে হবে। আগাছা দমনের জন্য ব্রি উইডার বেশ উপযোগী। উইডার প্রয়োগের পরে হাত দিয়ে সারির ভিতরের আগাছা পরিষ্কার করা দরকার। আগাছা দমনের জন্য আগাছানাশক ব্যবহার অধিক ফলপ্রসূ। বোরো মৌসুমে বীজ বপনের ৭-১০ দিনের মধ্যে এবং আমন ও আউশে ৪-৬ দিনের মধ্যে ২০-২৫ মিলিলিটার রনস্টার অথবা ১০-১২ মিলিলিটার রিফিট ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে সমানভাবে স্প্রে করতে হবে। জমিতে ২-৩ সেন্টিমিটার দাঁড়ানো পানি থাকা অবস্থায় আগাছানাশক প্রয়োগ করতে হবে।

অনিষ্টকারী পোকা ও মেরুদণ্ডী প্রাণী ব্যবস্থাপনা

নিবিড় চাষাবাদের কারণে ফসলে পোকার প্রাদুর্ভাব ও আক্রমণ বেড়েই চলেছে। ফলে অনিষ্টকারী পোকা বা বালাই দমন এবং ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব বেড়েছে। চিত্র ১৩-এ ১৫টি প্রধান অনিষ্টকারী পোকার সারা বছরে প্রাদুর্ভাবের সময় দেখানো হলো। এখানে দাগ যত

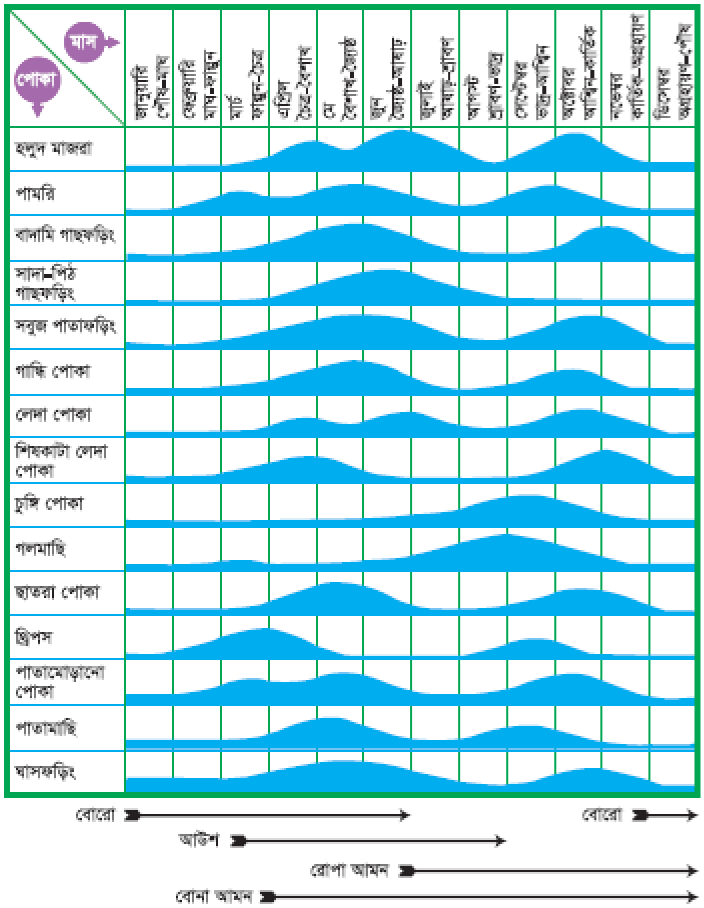

চিত্র ১৩। ধানের অনিষ্টকারী ১৫টি পোকার প্রাদুর্ভাব পঞ্জিকা।

মোটা পোকার প্রাদুর্ভাব তত বেশি অর্থাৎ ওই সময়ে পোকার আক্রমণ তীব্র হতে পারে। ধান ক্ষেতে ক্ষতিকারক পোকার সাথে কিছু বন্ধু পোকা-মাকড়, যেমন- মাকড়সা, লেডি-বার্ড বিটল, ক্যারাবিড বিটলসহ অনেক পরজীবী ও পরভোজী পোকা-মাকড় উপস্থিত থাকে। তাই কীটনাশক প্রয়োগ করার চেয়ে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করা উচিত।

চিত্র ১৪। মাজরা পোকা ও ডিমের গাদা।

চিত্র ১৫। মরা ডিগ।

মাজরা পোকা (Stem borer)

মাজরা পোকার (চিত্র ১৪) আক্রমণ ফুল ফোটার আগে হলে মরা ডিগ (চিত্র ১৫) এবং ফুল ফোটার পর হলে সাদা শিষ (চিত্র ১৬) বের হয়। ব্যবস্থাপনার জন্য–

- ডিমের গাদা সংগ্রহ (চিত্র ১৪) করে নষ্ট করে ফেলুন।
- আলোক-ফাঁদের সাহায্যে পোকা (মথ) সংগ্রহ করে দমন করুন।
- ডালপালা পুঁতে পোকাখেকো পাখির সাহায্য নিন।
- পরজীবী (বন্ধু) পোকা মাজরা পোকার ডিম নষ্ট করে; সুতরাং যথাসম্ভব কীটনাশক প্রয়োগ বিলম্বিত করুন।

চিত্র ১৬। সাদা শিষ।

- জমিতে শতকরা ১০-১৫ ভাগ মরা ডিগ অথবা শতকরা ৫ ভাগ সাদা শিষ দেখা দিলে অনুমোদিত কীটনাশক প্রয়োগ করুন (সারণী ১১)। আমন ধান কাটার পর চাষ দিয়ে নাড়া মাটিতে মিশিয়ে বা পুড়িয়ে ফেলুন।

নলিমাছি বা গলমাছি (Gall midge)

এ মাছির (চিত্র ১৭) কীড়া ধানগাছের বাড়ন্ত কুশিতে আক্রমণ করে এবং আক্রান্ত কুশি পেঁয়াজ পাতার মতো হয়ে যায়। ফলে কুশিতে আর শিষ হয় না। ব্যবস্থাপনার জন্য–

চিত্র ১৭। নলিমাছি এবং ক্ষতিগ্রস্ত পাতা (পেঁয়াজ পাতা)।

- রোপণের পর নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করুন।
- আলোক-ফাঁদ ব্যবহার করে পূর্ণবয়স্ক পোকা দমন করুন।
- জমিতে শতকরা ৫ ভাগ পেঁয়াজ পাতার লক্ষণ দেখা গেলে কীটনাশক ব্যবহার করুন (সারণী ১১)।
- নলিমাছি প্রতিরোধী ব্রি ধান৩৩ আক্রমণপ্রবণ এলাকায় চাষ করা যেতে পারে।

পামরি পোকা (Rice hispa)

পামরি পোকার কীড়া (চিত্র ১৮) পাতার ভেতরে সুড়ঙ্গ করে সবুজ অংশ খায়, আর পূর্ণবয়স্ক পোকা পাতার সবুজ অংশ কুরে কুরে খায়। এভাবে খাওয়ার ফলে পাতা সাদা দেখায় (চিত্র ১৯)। ব্যবস্থাপনার জন্য–

- হাতজাল বা মশারির কাপড় দিয়ে পোকা ধরে মেরে ফেলুন।
- জমিতে শতকরা ৩৫ ভাগ পাতার ক্ষতি হলে অথবা প্রতি গোছায় চারটি পূর্ণবয়স্ক পোকা অথবা প্রতি কুশিতে ৫টি কীড়া থাকলে কীটনাশক প্রয়োগ করুন (সারণী ১১)।

চিত্র ১৮। পামরি পোকার কীড়ার ক্ষতির নমুনা।

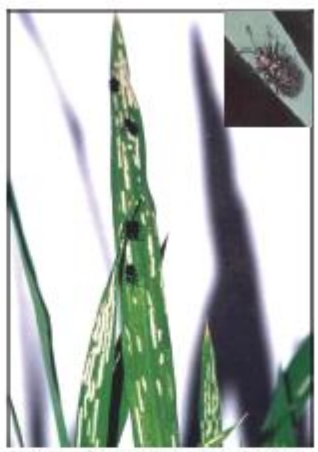

চিত্র ১৯। পূর্ণবয়স্ক পামরি পোকা ও ক্ষতির নমুনা।

পাতামোড়ানো পোকা (Leaf roller)

পাতামোড়ানো পোকার কীড়া গাছের পাতা লম্বালম্বিভাবে মুড়িয়ে (চিত্র ২০) পাতার ভিতরের সবুজ অংশ খায় (চিত্র ২১)। খুব বেশি ক্ষতি করলে পাতা পুড়ে যাওয়ার মতো দেখায়। ব্যবস্থাপনার জন্য–

চিত্র ২০। পাতামোড়ানো পোকার ক্ষতির নমুনা।

চিত্র ২১। পাতামোড়ানো পোকার কীড়া।

- আলোক-ফাঁদের সাহায্যে পোকা বা মথ (চিত্র ২২) দমন করুন।
- ক্ষেতে ডালপালা পুঁতে পোকাখেকো পাখি বসার ব্যবস্থা নিন।
- গাছে থোড় আসার সময় বা ঠিক তার আগে যদি শতকরা ২৫ ভাগ পাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে কীটনাশক প্রয়োগ করুন (সারণী ১১)।

চিত্র ২২। পূর্ণবয়স্ক পাতামোড়ানো পোকা।

চিত্র ২৩। পূর্ণবয়স্ক চুঙ্গি পোকা।

চুঙ্গি পোকা (Rice caseworm)

চুঙ্গি পোকা (চিত্র ২৩) পাতার উপরের অংশ কেটে ছোট ছোট চুঙ্গি তৈরি করে ভেতরে থাকে (চিত্র ২৪)। আক্রান্ত ক্ষেতে গাছের পাতা সাদা দেখায় এবং পাতার উপরের অংশ কাটা থাকে। দিনের বেলায় চুঙ্গিগুলো পানিতে ভাসতে থাকে (চিত্র ২৪)। ব্যবস্থাপনার জন্য–

- আলোক-ফাঁদের সাহায্যে মথ দমন করুন।
- পানি থেকে হাতজাল দিয়ে চুঙ্গিসহ কীড়া সংগ্রহ করে ধ্বংস করুন।
- আক্রান্ত জমির পানি সরিয়ে দিন এবং জমি শুকিয়ে নিন।
- জমিতে শতকরা ২৫ ভাগ পাতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে কীটনাশক প্রয়োগ করুন (সারণী ১১)।

চিত্র ২৪। চুঙ্গি পোকার ক্ষতির নমুনা।

লেদা পোকা (Swarming caterpillar)

এ পোকার কীড়া (চিত্র ২৫) পাতার পাশ থেকে কেটে এমনভাবে খায় যে কেবল ধানগাছের কাণ্ড অবশিষ্ট থাকে। সাধারণত শুকনো জমিতে এ পোকার আক্রমণের আশঙ্কা বেশি। ব্যবস্থাপনার জন্য–

- ধান কাটার পর জমি চাষ দিয়ে রাখুন অথবা নাড়া পুড়িয়ে ফেলুন।
- আলোক-ফাঁদের সাহায্যে মথ দমন করুন।
- ডালপালা পুঁতে পোকাখেকো পাখি বসার সুযোগ করে দিন।
- জমিতে ২৫ ভাগ পাতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে কীটনাশক ব্যবহার করুন (সারণী ১১)।

চিত্র ২৫। লেদা পোকা ও কীড়া।

ঘাসফড়িং (Grasshopper)

ঘাসফড়িং (চিত্র ২৬) পাতার পাশ থেকে শিরা পর্যন্ত খায়। জমিতে অধিক সংখ্যায় আক্রমণ করলে এদেরকে পঙ্গপাল বলা হয়। ব্যবস্থাপনার জন্য–

- হাতজাল দিয়ে পোকা ধরে মেরে ফেলুন।
- ডালপালা পুঁতে পোকাখেকো পাখি বসার সুযোগ করে দিন।

চিত্র ২৬। ঘাসফড়িং এবং এর ক্ষতির নমুনা।

- জমিতে শতকরা ২৫ ভাগ পাতা আক্রান্ত হলে কীটনাশক প্রয়োগ করুন (সারণী ১১)।

লম্বাশুঁড় উরচুঙ্গা (Long-horned cricket)

এ পোকা ধানের পাতা এমনভাবে খায় যে পাতার কিনারা ও শিরা বাকি থাকে (চিত্র ২৭)। ক্ষতিগ্রস্ত পাতা ঝাঁঝরা হয়ে যায়। ব্যবস্থাপনার জন্য–

- ডালপালা পুঁতে পোকাখেকো পাখি বসার সুযোগ করে দিন।
- আলোক-ফাঁদের সাহায্যে পূর্ণবয়স্ক উরচুঙ্গা দমন করুন।
- জমিতে শতকরা ২৫ ভাগ পাতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে কীটনাশক প্রয়োগ করুন (সারণী ১১)।

চিত্র ২৭। লম্বাশুঁড় উরচুঙ্গা এবং এর ক্ষতির নমুনা।

সবুজ পাতাফড়িং (Green leafhopper)

সবুজ পাতাফড়িং (চিত্র ২৮) ধানের পাতার রস শুষে খায়। ফলে গাছের বৃদ্ধি কমে যায় ও গাছ খাটো হয়ে যায়। এ পোকা টুংরো ভাইরাস রোগ ছড়িয়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে। ব্যবস্থাপনার জন্য–

- আলোক–ফাঁদের সাহায্যে পোকা দমন করুন।
- হাতজালের প্রতি টানে যদি একটি সবুজ পাতাফড়িং পাওয়া যায় এবং আশপাশে টুংরো রোগাক্রান্ত ধানগাছ থাকে, তাহলে বীজতলায় বা জমিতে উপযুক্ত কীটনাশক প্রয়োগ করুন (সারণী ১১)।

চিত্র ২৮। সবুজ পাতাফড়িং এবং টুংরো আক্রান্ত ধান ক্ষেত।

বাদামি গাছফড়িং (Brown planthopper)

বাদামি গাছফড়িং (চিত্র ২৯) ধানগাছের গোড়ায় বসে রস শুষে খায়। ফলে গাছ পুড়ে যাওয়ার রঙ ধারণ করে মরে যায়, তখন একে বলা হয় 'হপার বার্ন' বা 'ফড়িং পোড়া' (চিত্র ৩০)। ব্যবস্থাপনার জন্য–

- বোরো মৌসুমে ফেব্রুয়ারি এবং আমন মৌসুমে আগস্ট মাস থেকে নিয়মিত ধানগাছের গোড়ায় পোকার উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করুন। এসময় ডিম পাড়তে আসা লম্বা পাখা বিশিষ্ট ফড়িং আলোক–ফাঁদের সাহায্যে দমন করুন। ধানের চারা ঘন করে না লাগিয়ে ২৫ × ১৫ সেন্টিমিটার অথবা ২০ × ২০ সেন্টিমিটার দূরত্বে রোপণ করলে গাছ প্রচুর

আলো বাতাস পায়; ফলে পোকার বংশ বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে।

- পরিমিত ইউরিয়া সার ব্যবহার করুন।
- ধানগাছের গোড়ায় পোকা দেখা গেলে ক্ষেতে জমে থাকা পানি সরিয়ে জমি কয়েকদিন শুকিয়ে নিন।
- স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন ধানের জাত চাষ করলে এ পোকার আক্রমণ এড়ানো যায়।

চিত্র ২৯। বাদামি গাছফড়িং।

চিত্র ৩০। হপার বার্ন বা ফড়িং পোড়ার নমুনা।

- জমির অধিকাংশ গাছে ৪টি ডিমওয়ালা (পেট মোটা) পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী পোকা বা ১০টি বাচ্চা বাদামি গাছফড়িং বা উভয়ই দেখা গেলে অনুমোদিত কীটনাশক ব্যবহার করুন (সারণী ১১)। কীটনাশক অবশ্যই গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ডাবল নজল স্প্রেয়ার ব্যবহার করা যেতে পারে (চিত্র ৩১)। জমির অধিকাংশ গাছে অন্তত একটি মাকড়সা দেখা গেলে কীটনাশক ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ মাকড়সা বাদামি গাছফড়িং খেয়ে ধ্বংস করে।
- সিনথেটিক পাইরিথ্রোয়েড গোত্রের কীটনাশকসমূহ ধান ফসলে ব্যবহার নিষিদ্ধ, যেমন- সাইপারমেথ্রিন, আলফা সাইপারমেথ্রিন, লেমডা সাইহেলোথ্রিন, ডেলটামেথ্রিন ও ফেনভালারেট। উল্লিখিত কীটনাশকসমূহ ধানগাছে প্রয়োগ করলে বাদামি গাছফড়িং দমন হয় না বরং এদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পায়। ফলে জমিতে ফড়িং পোড়া সৃষ্টি হয়।

- বাদামি গাছফড়িংয়ের আক্রমণ শুরু হলে গ্রামের সব লোক মিলে এ পোকা দমনের জন্য জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় এ পোকা বংশ বিস্তার করে গ্রামের সব ধান ক্ষেত ধ্বংস করে দিতে পারে।

চিত্র ৩১। ডবল নজল স্প্রে এর নমুনা।

সাদা-পিঠ গাছফড়িং (White-backed planthopper)

বাদামি গাছফড়িংয়ের মতো সাদা-পিঠ গাছফড়িং (চিত্র ৩২) ধানগাছের গোড়ায় বসে রস শুষে খায়। এ পোকার আক্রমণেও হপার বার্ন হয়। বাদামি গাছফড়িংয়ের মতো এ পোকা দমনের জন্য একই ব্যবস্থা নিন।

চিত্র ৩২। সাদা-পিঠ গাছফড়িং।

ছাতরা পোকা (Mealy bug)

শুকনো আবহাওয়া বা খরার সময় ছাতরা পোকার (চিত্র ৩৩) আক্রমণ বেশি হয়। এ পোকা গাছের কাণ্ড ও পাতার খোলের মধ্যবর্তী স্থানে একত্রে অনেক সংখ্যক থাকে, আক্রান্ত স্থানে সাদা মোমের মতো পদার্থ দেখা যায়। আক্রমণ তীব্র হলে গাছে শিষ বের হয় না। ব্যবস্থাপনার জন্য–

- আক্রান্ত গাছ উপড়িয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলুন।
- শুধু আক্রান্ত জায়গায় কীটনাশক প্রয়োগ করে এ পোকা দমন করা যায় (সারণী ১১)।

চিত্র ৩৩। ছাতরা পোকা ও মোমের আবরণ।

থ্রিপস (Thrips)

ধানের চারা এবং রোপণের পর কুশি অবস্থায় এ পোকার আক্রমণ দেখা যায়। থ্রিপস পাতায় ক্ষত সৃষ্টি করে রস শুষে খায়। ফলে পাতা লম্বালম্বিভাবে মুড়ে যায়। ব্যবস্থাপনার জন্য–

- বীজতলায়/জমিতে পানি দিয়ে ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগ করুন।
- আক্রমণ বেশি হলে কীটনাশক প্রয়োগ করুন (সারণী ১১)।

গান্ধি পোকা (Rice bug)

গান্ধি পোকা (চিত্র ৩৪) ধানের দানায় দুধ সৃষ্টির সময় আক্রমণ করে। বয়স্ক গান্ধি পোকার গা থেকে বিশ্রী গন্ধ বের হয় এবং ক্ষেতে গেলেই তা বোঝা যায়। ব্যবস্থাপনার জন্য–

- আলোক–ফাঁদের সাহায্য নিন।
- গড়ে প্রতি ২–৩টি গোছায় একটি গান্ধি পোকা দেখা গেলে কীটনাশক প্রয়োগ করুন (সারণী ১১)।
- কীটনাশক বিকেল বেলায় প্রয়োগ করতে হবে।

চিত্র ৩৪। গান্ধি পোকা ও এর ক্ষতির নমুনা।

শিষ কাটা লেদা পোকা (Earcutting caterpillar)

এ পোকার কীড়া পাতার পাশ থেকে কেটে খায় এবং শিষের গোড়া কেটে দেয়। কীড়াগুলো রাতে ধান ক্ষেতে আক্রমণ করে। এ পোকা দমনের জন্য–

- নাড়া পুড়িয়ে ফেলুন।
- ডালপালা পুঁতে পোকাখেকো পাখি বসার সুযোগ করে দিন।
- জমিতে সেচ প্রদান করে কীড়া দমন করা যায়।

সারণী ১১। ধানের অনিষ্টকারী পোকা দমনের জন্য অনুমোদিত কীটনাশক ও প্রয়োগ মাত্রা।

কীটনাশক	প্রয়োগ মাত্রা/ হেক্টর	কীটনাশক	প্রয়োগ মাত্রা/ হেক্টর
		মাজরা পোকা ও গলমাছি	
ডায়াজিনন (৬০ তরল)	১.৭০ লিটার	ডায়াজিনন (১০ দানাদার)	১৬.৮০ কেজি
ফেনথোয়েট (৫০ তরল)	১.৭০ লিটার	কুইনালফস (৫ দানাদার)	১৬.৮০ কেজি
ফেনথিয়ন (৫০ তরল)	১.১২ লিটার	কার্বোফুরান (৩ দানাদার)	১৬.৮০ কেজি
ফেনিট্রোথিয়ন (৫০ তরল)	১.১২ লিটার	কার্বোফুরান (৫ দানাদার)	১০.০০ কেজি
কুইনালফস (২৫ তরল)	১.৫০ লিটার	ফিপ্রোনিল (৩ দানাদার)	১০.০০ কেজি
কার্বোসালফান (২০ তরল)	১.৫০ লিটার	ফিপ্রোনিল (৫০ পানিতে দ্রবণীয়)	৫০০ মিলিলিটার
ক্লোরপাইরিফস (২০ তরল)	১.০০ লিটার	ডায়াজিনন (১৪ দানাদার)	১৩.৫০ কেজি
কারটাপ (৫০ পাউডার)	১.৪০ কেজি		
		শুধু মাজরা পোকা	
ফ্লুবেনডিয়ামাইড (২৫ ডব্লিওডিজি)			০.২ কেজি
ক্লোরান্ট্রানিলিপ্রোল (০.৪ দানাদার)			১০.০ কেজি
থায়ামেথোক্সাম + ক্লোরান্ট্রানিলিপ্রোল (০.৬ দানাদার)			৫.০ কেজি
থায়ামেথোক্সাম + ক্লোরান্ট্রানিলিপ্রোল (৪০ ডব্লিউজি)			০.০৭৫ কেজি
ক্লোরান্ট্রানিলিপ্রোল ১৮.৫ (পানিতে দ্রবণীয়)			০.১৫ লিটার
কারটাপ ৯২%+এসিটামিপ্রিড ৩% (৯৫ এসপি)			১৫০ গ্রাম

সারণী ১১। ক্রমশ।

কীটনাশক	প্রয়োগ মাত্রা/ হেক্টর	কীটনাশক	প্রয়োগ মাত্রা/ হেক্টর
	পামরি পোকা		
ডাইমেথোয়েট (৪০ তরল)	১.১২ লিটার	কুইনালফস (২৫ তরল)	১.০০ লিটার
ফেনিট্রোথিয়ন (৫০ তরল)	১.০০ লিটার	ক্লোরপাইরিফস (২০ তরল)	১.০০ লিটার
ম্যালাথিয়ন (৫৭ তরল)	১.০০ লিটার	কারবারিল (৮৫ পাউডার)	১.৩৪ কেজি
ফজালোন (৩৫ তরল)	১.০০ লিটার	এমআইপিসি (৭৫ পাউডার)	১.১২ কেজি
ফেনথিয়ন (৫০ তরল)	১.০০ লিটার	ফিপ্রোনিল (৫০ পানিতে দ্রবণীয়)	৫০০ মিলিলিটার
ডায়াজিনন (৬০ তরল)	১.০০ লিটার	কার্বোসালফান (২০ তরল)	১.১২ লিটার
	পাতামোড়ানো পোকা ও চুঙ্গি পোকা		
ম্যালাথিয়ন (৫৭ তরল)	১.০০ লিটার	ফরমোথিয়ন (২৫ তরল)	১.১২ লিটার
ফেনিট্রোথিয়ন (৫০ তরল)	১.০০ লিটার	কারবারিল (৮৫ পাউডার)	১.৭০ কেজি
ফজালোন (৩৫ তরল)	১.০০ লিটার	এমআইপিসি (৭৫ পাউডার)	১.১২ কেজি
ডাইমেথোয়েট (৪০ তরল)	১.০০ লিটার	ডায়াজিনন (১০ দানাদার)	১৬.৮০ কেজি
	ঘাসফড়িং ও লম্বাশুঁড় উরচুঙ্গা		
ফজালোন (৩৫ তরল)	১.০০ লিটার	কুইনালফস (২৫ তরল)	১.৫০ লিটার
কার্বোসালফান (২০ তরল)	১.৫০ লিটার	বিপিএমসি (৫০ তরল)	১.০০ লিটার
	শিষকাটা লেদাপোকা ও লেদাপোকা		
কারবারিল (৮৫ পাউডার)	১.৭০ কেজি		
	বাদামি গাছফড়িং, সাদা-পিঠ গাছফড়িং ও ছাতরা পোকা		
ম্যালাথিয়ন (৫৭ তরল)	১.০০ লিটার	কার্বোফুরান (৩ দানাদার)	১৬.৮০ কেজি
ফেনিট্রোথিয়ন (৫০ তরল)	১.০০ লিটার	এমআইপিসি (৭৫ পাউডার)	১.৩০ কেজি
	শুধু বাদামি গাছফড়িং-এর জন্য		
কার্বোসালফান (২০ তরল)	১.০০ লিটার	ডায়াজিনন (১০ দানাদার)	১৬.৮০ কেজি
ফজালোন (৩৫ তরল)	১.০০ লিটার	কার্বোফুরান (৩ দানাদার)	১৬.৮০ কেজি
ফেনিট্রোথিয়ন (৫০ তরল)	১.০০ লিটার	কারবারিল (৮৫ পাউডার)	১.৫০ কেজি
ডায়াজিনন (৬০ তরল)	১.০০ লিটার	থায়ামেথোক্সাম (২৫ পাউডার)	৬০.০০ গ্রাম
ক্লোরপাইরিফস (২০ তরল)	১.০০ লিটার	ফিপ্রোনিল (৩ দানাদার)	১০.০০ কেজি
ডাইমেথোয়েট (৪০ তরল)	১.০০ লিটার	ফেনিট্রোথিয়ন (৭৫ তরল)+ বিপিএমসি	৭.৫০ মিলিলিটার
ম্যালাথিয়ন (৫৭ তরল)	১.০০ লিটার	ইমিডাক্লোপ্রিড (২০ তরল)	১২৫ মিলিলিটার
বিপিএমসি (৫০ তরল)	১.০০ লিটার	প্রপোক্সার (২০ তরল)	১.২৫ লিটার
কার্বোফুরান (৫ দানাদার)	১০.০০ কেজি	কারটাপ ৫০ (পাউডার)	১.২ কেজি
এমআইপিসি (৭৫ পাউডার)	১.৩০ কেজি	ফিপ্রোনিল ৫০ (পানিতে দ্রবণীয়)	৫০০ মিলিলিটার
পাইমেট্রোজিন (৪০ ডব্লিউজি)	০.৫০ কেজি	এসিটামিপ্রিড (২০ এসপি)	০.০৫ কেজি
এসিফেট (৭৫ এসপি)	৭৫০ গ্রাম		

সারণী ১১। ক্রমশ।

কীটনাশক	প্রয়োগ মাত্রা/ হেক্টর	কীটনাশক	প্রয়োগ মাত্রা/ হেক্টর
	সবুজ পাতাফড়িং, থ্রিপস, গান্ধিপোকা		
ম্যালাথিয়ন (৫৭ তরল)	১.০০ লিটার	এমআইপিসি (৭৫ পাউডার)	১.১২ কেজি
ফেনিট্রোথিয়ন (৫০ তরল)	১.০০ লিটার	কারবারিল (৮৫ পাউডার)	১.৭০ কেজি
ফজালোন (৩৫ তরল)	১.০০ লিটার	ফরমোথিয়ন (২৫ তরল)	১.১২ লিটার
ডাইমেথোয়েট (৪০ তরল)	১.১২ লিটার	ইটোফেনপ্রোক্স (১০ তরল)	৫০০ মিলিলিটার
কুইনালফস (২৫ তরল)	১.৫০ লিটার		

বিশেষ দ্রষ্টব্য : কীটনাশকের বাণিজ্যিক নামের পরিবর্তে জেনেরিক বা সাধারণ নাম ব্যবহার করা হলো। তরল ও পাউডার জাতীয় কীটনাশকগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী ৬০০-৮০০ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে মেশিন দিয়ে ভালভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। দানাদার কীটনাশক ব্যবহারের বেলায় জমিতে ২-৪ সেন্টিমিটার পানি ৫-৭ দিন আটকিয়ে রাখতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, জমির পানি যেন উপচে না পড়ে। কীটনাশক ব্যবহার করতে হলে পোকার আক্রমণ সঠিকভাবে শনাক্ত করতে হবে, সঠিক মাত্রায় কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে, পোকার অবস্থান ও আবহাওয়া দেখে কীটনাশক ছিটাতে হবে এবং কীটনাশকের ব্যবহার ভালভাবে জানতে হবে। তাছাড়াও কীটনাশক ব্যবহারকারীকে তার প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত নিরাপত্তা পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করতে হবে (চিত্র ৩৫)।

এক হেক্টর = ৭.৪৭ বিঘা (২৪৭ শতাংশ) এবং এক চামচ = ৫ মিলিলিটার বা ৫ সিসি

চিত্র ৩৫। নিরাপত্তা পোষাক পরিহিত অবস্থায় স্প্রে করার নমুনা।

ইঁদুর দমন

ইঁদুর ধানগাছের কুশি কেটে দেয় (চিত্র ৩৬)। ধান পাকলে ধানের ছড়া কেটে মাটির নিচে সুড়ঙ্গ করে জমা রাখে। ধানের জমিতে মাঠের বড় কালো ইঁদুর (চিত্র ৩৭), মাঠের ছোট কালো ইঁদুর (চিত্র ৩৮) প্রধানত ক্ষতি করতে দেখা যায়। আর গুদামঘরের শস্য গেছো বা ঘরের ইঁদুর (চিত্র ৩৯) ক্ষতি করে। ব্যবস্থাপনার জন্য-

চিত্র ৩৬। ইঁদুরের ক্ষতির নমুনা।

- জমির আইল ও সেচ নিষ্কাশন নালা যথাসম্ভব কম সংখ্যক ও চিকন রাখতে হবে।
- একটি এলাকায় যথাসম্ভব একই সময় ধান রোপণ ও কর্তন করা যায় এমনভাবে চাষ করতে হবে।

চিত্র ৩৭। মাঠের বড় কালো ইঁদুর।

চিত্র ৩৮। মাঠের কালো ইঁদুর।

- ফাঁদ পেতে ইঁদুর দমন করুন।
- বিষটোপ দিয়ে ইঁদুর দমন করা যায়।
- ইঁদুরের নতুন গর্তে ফসটক্সিন বড়ি দিয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করে দিন।

আলোক-ফাঁদ তৈরি পদ্ধতি : রাতের বেলায় ধানের জমি থেকে একটু দূরে খালি জায়গায় হারিকেন, হ্যাজাক লাইট অথবা বৈদ্যুতিক বাতি স্থাপন করে তার নিচে একটি পাত্রে কেরোসিন তেল মিশ্রিত পানি রাখতে হবে। সন্ধ্যার পর বাতি জ্বালিয়ে রাখলে সেখানে অনেক পোকা এসে মারা পড়বে।

চিত্র ৩৯। গেছো বা ঘরের ইঁদুর।

পোকা দমনে পাখি

ধানের অনিষ্টকারী পোকা দমনে পরিবেশ-বান্ধব কৌশল হিসেবে উপকারী পাখির ব্যবহার নিয়ে ব্রিতে গবেষণা হয়েছে।

- সমীক্ষায় দেখা গেছে, ফিঙে পাখি বিভিন্ন ধরনের পোকা খেয়ে খুব তাড়াতাড়ি এদের সংখ্যা কমিয়ে দেয়। তাই জমিতে প্রতি ১০০ বর্গমিটারে পাখি বসার জন্য একটি (হেক্টরে ১০০টি) ডালপালা পুঁতে দিলে পাখির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়; ফলে পোকা খাওয়ার ক্ষমতা অন্তত চারগুণ বৃদ্ধি পায়। পাখি গাছের উপরের দিকে অবস্থানকারী অনিষ্টকারী পোকার পাশাপাশি কিছু উপকারী পোকাও খায়। কিন্তু পাখি অনিষ্টকারী পোকা বেশি পছন্দ করে বিধায় তাদের খেয়ে ফেলে। তাই অনিষ্টকারী পোকার সংখ্যা যখন বাড়তে থাকে তখন ধান ক্ষেতে ডালপালা পুঁতে দিলে এ ধরনের পোকার সংখ্যা আর বাড়তে পারে না।

চিত্র ৪০। পোকাখেকো পাখি ও বসার ডালপালা।

- মাঠে ডালপালা পুঁতে পোকাখেকো পাখির সাহায্য নেওয়ার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন, ডালপালাটি পাখি বসার উপযুক্ত অর্থাৎ শক্ত ও ধানগাছের চেয়ে বেশ উঁচু হয় (চিত্র ৪০) এবং পাখি যেন পোকা দেখতে ও ধরতে পারে।
- ধানের জমিতে ব্যাঙও অনিষ্টকারী পোকার সংখ্যা কমিয়ে রাখতে পারে। ব্রির সমীক্ষায় ব্যাঙমুক্ত জমির চেয়ে ১০-৩০টি ব্যাঙযুক্ত জমিতে শতকরা ১৬-৪১ ভাগ পোকা কম পাওয়া গেছে এবং এর ফলে ৬-১৯ ভাগ ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাঙ প্রতিদিন গড়ে প্রায় শতকরা ৫৪ ভাগ ঘাসফড়িং, ৪৭ ভাগ হলুদ মাজরা পোকা, ৩৭ ভাগ সবুজ পাতাফড়িং, ৩৫ ভাগ বাদামি ঘাসফড়িং এবং ৯ ভাগ পামরি পোকা খেয়ে ফেলতে পারে।

ধানের রোগ ব্যবস্থাপনা

রোগ ধানের ক্ষতি করে এবং ফলন কমিয়ে দেয়। এ জন্য রোগ শনাক্ত করে তার জন্য ব্যবস্থাপনা নিতে হবে। বাংলাদেশে ধানের শনাক্তকৃত ৩২টি রোগের মধ্যে ১০টি প্রধান। কোন জাতে কি রোগ সহনশীলতা আছে তা সারণী ১২-এ দেয়া হলো। এছাড়া এখানে পর্যায়ক্রমে ধানের ১০টি প্রধান রোগ শনাক্তকরণ এবং তার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সারণী ১২। রোগ সহনশীল ধানের জাত।

ধানের জাত	যে রোগে সহনশীল	ধানের জাত	যে রোগে সহনশীল
বিআর৩	ব্লাস্ট, টুংরো ও খোলপোড়া	ব্রি ধান৩২	পাতাপোড়া, ব্লাস্ট ও খোলপোড়া
বিআর১৪	টুংরো ও ব্লাস্ট	ব্রি ধান৩৩	ব্লাস্ট ও পাতাপোড়া
বিআর১৫	ব্লাস্ট	ব্রি ধান৩৭	টুংরো ও পাতাপোড়া
বিআর১৬	টুংরো ও ব্লাস্ট	ব্রি ধান৩৯	টুংরো ও খোলপোড়া
বিআর১৯	পাতাপোড়া	ব্রি ধান৪১	টুংরো ও খোলপোড়া
বিআর২২	টুংরো ও খোলপোড়া	ব্রি ধান৪২	টুংরো
বিআর২৩	খোলপোড়া	ব্রি ধান৪৪	ব্লাস্ট ও পাতাপোড়া
বিআর২৪	ব্লাস্ট	ব্রি ধান৪৫	ব্লাস্ট
বিআর২৬	পাতাপোড়া		

টুংরো (Tungro)

টুংরো ভাইরাসজনিত রোগ। সবুজ পাতাফড়িং এ রোগের বাহক। চারা অবস্থা থেকে গাছে ফুল ফোটা পর্যন্ত সময়ে এ রোগ দেখা দিতে পারে। ধানের ক্ষেতে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় গাছের পাতা হলুদ বা কমলা রঙ ধারণ করে (চিত্র ৪১) অনেক ক্ষেত্রে সালফার বা নাইট্রোজেন সারের ঘাটতিজনিত কারণে এবং ঠাণ্ডার প্রকোপে এরূপ হতে পারে। সেক্ষেত্রে সমস্ত জমির ধান বিক্ষিপ্তভাবে না হয়ে সমভাবে হলুদাভ বা কমলা রঙ ধারণ করবে। গাছের বাড়-বাড়তি ও কুশি কমে যায় ফলে আক্রান্ত গাছ সুস্থ গাছের তুলনায় খাটো হয়। ব্যবস্থাপনার জন্য–

- রোগের প্রাথমিক অবস্থায় রোগাক্রান্ত গাছ তুলে মাটিতে পুঁতে ফেলুন।
- আগাম বীজতলায় বিশেষ করে আমন ধান কাটার সময় বোরোর বীজতলায় সবুজ পাতাফড়িং দেখা গেলে হাতজাল বা কীটনাশক প্রয়োগ করে দমনের ব্যবস্থা নিন।
- নিবিড় ধান চাষ এলাকায় ভলান্টিয়ার রাইস/রেটুন ধান তুলে মাটিতে পুঁতে ফেলুন অথবা জমিতে চাষ দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিন।

চিত্র ৪১। টুংরো আক্রান্ত ধান।

- আলোক-ফাঁদ ব্যবহার করে বাহক পোকা সবুজ পাতাফড়িং মেরে ফেলুন।
- সবুজ পাতাফড়িং দমনে কীটনাশক প্রয়োগ করুন (সারণী ১১)।

ব্যাকটেরিয়াজনিত পোড়া (Bacterial blight)

চারা রোপণের ১৫-২০ দিনের মধ্যে এবং বয়স্ক গাছে এ রোগ দেখা যায়। আক্রান্ত চারা গাছের গোড়া পচে যায়, পাতা নেতিয়ে পড়ে হলুদাভ হয়ে মারা যায়। এ অবস্থাকে কৃসেক বলে। রোগাক্রান্ত কাণ্ডের গোড়ায় চাপ দিলে আঠালো ও দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ বের হয়।

বয়স্ক গাছে সাধারণত থোড় অবস্থা থেকে পাতাপোড়া লক্ষণ দেখা যায়। প্রথমে পাতার অগ্রভাগ থেকে কিনারা বরাবর আক্রান্ত হয়ে নিচের দিকে বাড়তে থাকে (চিত্র ৪২)। আক্রান্ত অংশ প্রথমে জলছাপ এবং পরে হলুদাভ হয়ে খড়ের রঙ ধারণ করে। ক্রমশ সম্পূর্ণ পাতাটাই মরে শুকিয়ে যায়। অতি মাত্রায় ইউরিয়া সারের ব্যবহার, শিলাবৃষ্টি ও ঝড়ো আবহাওয়া এ রোগ বিস্তারে সাহায্য করে। ব্যবস্থাপনার জন্য–

চিত্র ৪২। ব্যাকটেরিয়াজনিত পোড়া রোগাক্রান্ত ধান।

- সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার করুন।
- রোগ দেখা দিলে অতিরিক্ত ৫ কেজি/বিঘা হারে পটাশ সার উপরিপ্রয়োগ করুন।
- ঝড়-বৃষ্টি এবং রোগ দেখা দেওয়ার পর ইউরিয়া সারের উপরিপ্রয়োগ সাময়িক বন্ধ রাখুন।
- কৃসেক হলে আক্রান্ত জমির পানি শুকিয়ে ৭-১০ দিন পর আবার সেচ দিন।
- রোগাক্রান্ত জমির ফসল কাটার পর নাড়া পুড়িয়ে ফেলুন।

উফরা (Ufra)

উফরা ধানের কৃমিজনিত রোগ (চিত্র ৪৩)। কৃমি ধানগাছের কচি পাতা ও খোলের সংযোগস্থলে আক্রমণ করে। কৃমি গাছের রস শোষণ করায় প্রথমে পাতার গোড়ায় ছিটে-ফোঁটা সাদা দাগ দেখা যায়। ক্রমান্বয়ে সে দাগ বাদামি রঙের হয়ে পুরো আগাটাই শুকিয়ে মরে যায়। আক্রমণের প্রকোপ বেশি হলে গাছের বাড়-বাড়তি কম হয়। থোড় অবস্থায় আক্রমণ করলে থোড়ের মধ্যে শিষ মোচড়ানো অবস্থায় থেকে যায় (চিত্র ৪৪)। ফলে শিষ বের হতে পারে না। কৃমি পরিত্যক্ত নাড়া, খড়কুটো এবং ঘাসে এমনকি মাটিতে কুণ্ডলী পাকিয়ে বেঁচে থাকে। ব্যবস্থাপনার জন্য–

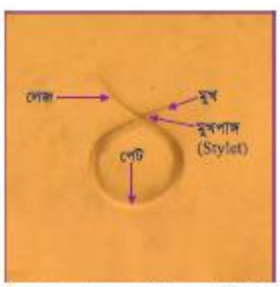

চিত্র ৪৩। ধানের কৃমি (আনুবীক্ষণিক ছবি)।

- রোগ দেখা দিলে হেক্টরপ্রতি ২০ কেজি হারে ফুরাডান ৫ জি অথবা কিউরেটার ৫ জি প্রয়োগ করুন।

- রোগাক্রান্ত জমির ফসল কাটার পর নাড়া পুড়িয়ে ফেলুন।
- সম্ভব হলে জমি চাষ দিয়ে ১৫-২০ দিন ফেলে রাখুন।
- আক্রান্ত জমিতে বীজতলা না করা।
- ধানের পরে ধান আবাদ না করে অন্য ফসলের চাষ করুন।
- জলি আমন ধানে আক্রান্ত জমিতে কারবেনডাজিম ২% হারে স্প্রে করলে সুফল পাওয়া যায়।

চিত্র ৪৪। কৃমি আক্রান্ত পাতা ও শিষ।

ব্লাস্ট (Blast)

ব্লাস্ট ছত্রাকজনিত রোগ। এ রোগ পাতায় হলে পাতা ব্লাস্ট, গিটে হলে গিট বাস্ট ও শিষে হলে শিষ বাস্ট বলা হয়। পাতা বাস্ট হলে পাতায় ছোট ছোট ডিম্বাকৃতি দাগ সৃষ্টি করে। আস্তে আস্তে দাগ বড় হয়ে দু'প্রান্ত লম্বা হয়ে চোখের আকৃতি ধারণ করে (চিত্র ৪৫)। দাগের চার ধারে বাদামি ও মাঝের অংশ সাদা বা ছাই বর্ণ ধারণ করে। অনেকগুলো দাগ একত্রে মিশে গিয়ে পুরো পাতা মরে যায়। এ রোগের কারণে জমির সমস্ত ধান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ রোগ বোরো মৌসুমে বেশি হয়। গিট বাস্ট এবং শিষ বাস্ট (চিত্র ৪৬) হলে গিট ও শিষের গোড়া কালো হয়ে যায় ও ভেঙ্গে পড়ে এবং ধান চিটা হয়ে যায়। রাতে ঠাণ্ডা, দিনে গরম, রাতে শিশির পড়া এবং সকালে কুয়াশা থাকলে এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ব্যবস্থাপনার জন্য–

চিত্র ৪৫। পাতা ব্লাস্ট।

চিত্র ৪৬। শিষ ব্লাস্ট।

- জমিতে জৈব সার প্রয়োগ করুন।
- জমিতে পানি ধরে রাখুন।
- রোগমুক্ত জমি থেকে বীজ সংগ্রহ করুন।
- সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করুন। আক্রান্ত জমিতে ইউরিয়া সারের উপরিপ্রয়োগ সাময়িক বন্ধ রেখে প্রতি হেক্টরে ৪০০ গ্রাম ট্রুপার বা নেটিভো ১০-১৫ দিনের ব্যবধানে দু'বার প্রয়োগ করুন।
- সকল সুগন্ধি ধান, হাইব্রিড ধান এবং লবণ সহনশীল ব্রি ধান২৮, ব্রি ধান২৯, ব্রি ধান৬৩ ও ব্রি ধান৬৪ ধানে ফুল আসার সময় নিম্নচাপ দেখা দিলে উল্লিখিত ছত্রাকনাশক আগাম স্প্রে করতে হবে।

খোলপোড়া (Sheath blight)

খোলপোড়া ছত্রাকজনিত রোগ। ধান গাছের কুশি গজানোর সময় হতে রোগটি দেখা যায়। প্রথমে খোলে ধূসর জলছাপের মতো দাগ পড়ে। দাগের মাঝখানে ধূসর হয় এবং কিনারা বাদামি রঙের রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে। দাগ আস্তে আস্তে বড় হয়ে সমস্ত খোলে ও পাতায় অনেকটা গোখরো সাপের চামড়ার মতো চক্কর দেখা যায় (চিত্র ৪৭)। গরম ও আর্দ্র আবহাওয়া, বেশি মাত্রায় ইউরিয়া ব্যবহার ও ঘন করে চারা রোপণ এ রোগ বিস্তারে সহায়তা করে। ব্যবস্থাপনার জন্য–

- জমিতে শেষ মই দেয়ার পর পানিতে ভাসমান আবর্জনা সুতি কাপড় দিয়ে তুলে মাটিতে পুঁতে ফেলুন।
- পটাশ সার সমান দু'কিস্তিতে ভাগ করে এক ভাগ জমি তৈরির শেষ চাষে এবং অন্য ভাগ শেষ কিস্তি ইউরিয়া সার প্রয়োগের সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- নেটিভো, ফলিকুর, কনটাফ, হেক্সাকোনাজল খোল-পোড়া রোগ দমনে কার্যকর ছত্রাকনাশক। আক্রান্ত ধানগাছের চার পাশের কয়েকটি সুস্থ গুছিসহ বিকেলে (সূর্যের আলো কমলে) গাছের উপরিভাগে এটি স্প্রে করুন। ছত্রাকনাশকের মাত্রা লেবেলে দেখুন।
- সুষম সার ব্যবহার করুন।

চিত্র ৪৭। খোলপোড়া রোগের লক্ষণ।

বাকানি (Bakanae)

এটি ছত্রাকজনিত রোগ। আক্রান্ত কুশি দ্রুত বেড়ে অন্য গাছের তুলনায় লম্বা ও লিকলিকে হয়ে যায় (চিত্র ৪৮) এবং হালকা সবুজ রঙের হয়। গাছের গোড়ার দিকে পানির উপরের গিঁট থেকে শিকড় বের হয়। ধীরে ধীরে আক্রান্ত গাছ মরে যায়। ব্যবস্থাপনার জন্য–

- রোগাক্রান্ত কুশি তুলে ফেলুন।
- এ রোগ বীজবাহিত। তাই বীজ শোধন করতে পারলে ভাল হয়। এ জন্য কারবেনডাজিম গ্রুপের যে কোন ছত্রাকনাশকের তিন গ্রাম ওষুধ এক লিটার পানিতে মিশিয়ে অঙ্কুরিত বীজে স্প্রে করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। তাছাড়া একই পরিমাণ ওষুধ দিয়ে সারা রাত চারা শোধন করেও ভাল ফল পাওয়া যায়।

চিত্র ৪৮। বাকানি আক্রান্ত ধান ক্ষেত।

বাদামি দাগ (Brown spot)

এটি ছত্রাকজনিত রোগ। এ রোগ হলে পাতায় প্রথমে ছোট ছোট বাদামি দাগ দেখা যায়। দাগের মাঝখানটা হালকা বাদামি রঙের হয়। অনেক সময় দাগের চারদিকে হলুদ আভা দেখা যায় (চিত্র ৪৯)। ব্যবস্থাপনার জন্য–

চিত্র ৪৯। বাদামি দাগ রোগের লক্ষণ।

- জমিতে জৈব সার প্রয়োগ করুন।
- ইউরিয়া ও পটাশ সার উপরিপ্রয়োগ করুন।
- সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার করুন।
- পর্যায়ক্রমে জমিতে পানি সেচ দিন এবং জমি শুকিয়ে নিন।
- আক্রান্ত জমিতে শিষ বের হওয়ার পর ৬০ গ্রাম পটাশ ও ৬০ গ্রাম থিওভিট ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতক জমিতে স্প্রে করলে ধানে বাদামি দাগ কম হয়।
- কারবেনডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক দিয়ে (বীজ ০.৩% দ্রবণে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে) বীজ শোধন করুন।
- বীজ উৎপাদনের জন্য দানা গঠন অবস্থায় ফলিকুর স্প্রে করুন।

চিত্র ৫০। খোলপচা রোগের লক্ষণ।

খোলপচা (Sheath rot)

এটি ছত্রাকজনিত রোগ। এ রোগ ধানগাছের ডিগপাতার খোলে হয়। রোগের শুরুতে ডিগপাতার খোলের উপরের অংশে গোলাকার বা অনিয়মিত আকারের বাদামি দাগ দেখা যায় (চিত্র ৫০)। আস্তে আস্তে দাগটি বড় হতে থাকে এবং গাঢ় ধূসর রঙ ধারণ করে। এ অবস্থায় অনেক সময় শিষ বের হতে পারে না অথবা রোগের প্রকোপ অনুযায়ী আংশিক বের হয় এবং বেশিরভাগ ধান কালো ও চিটা হয়ে যায়। ব্যবস্থাপনার জন্য-

- আক্রান্ত খড়কুটো জমিতে পুড়িয়ে ফেলুন।
- সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করুন।
- খোলপোড়া রোগের ছত্রাকনাশক এ রোগের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করুন।

ধানের দশটি রোগের প্রাদুর্ভাব সময়ের পঞ্জিকা চিত্র ৫১-এ দেখানো হয়েছে। এখানে দাগ যত মোটা ওই সময়ে রোগের প্রাদুর্ভাব তত বেশি হয়। এটি দেখে রোগবালাই সম্পর্কে সতর্ক হোন।

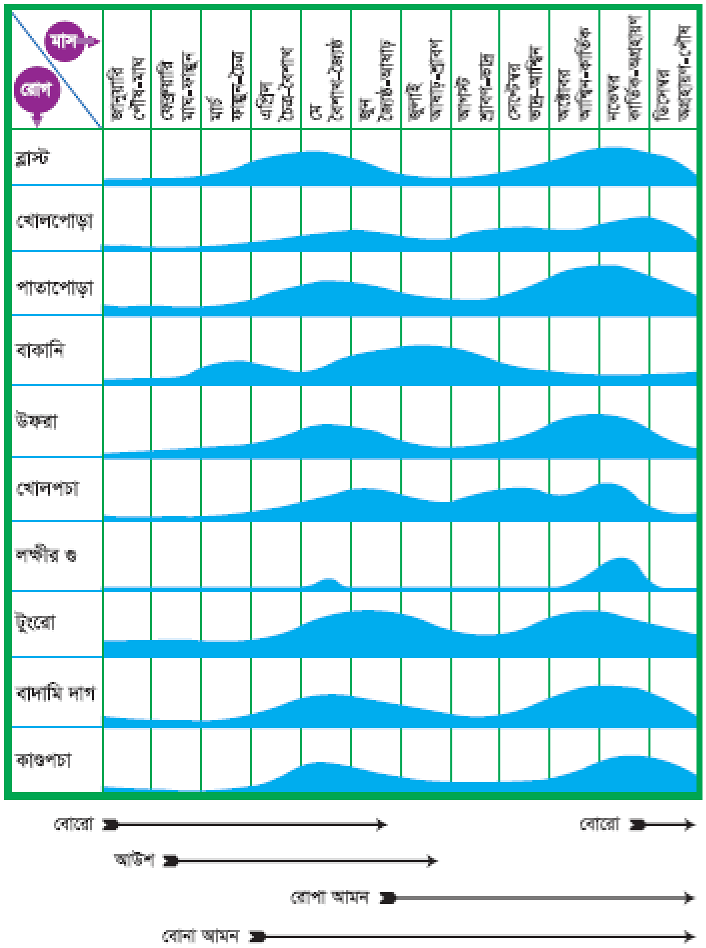

চিত্র ৫১। ধানের দশটি রোগের প্রাদুর্ভাব পঞ্জিকা।

লক্ষীর গু (False smut)

এটিও ছত্রাকজনিত রোগ। ধান পাকার সময় এ রোগ দেখা যায়। ছত্রাক ধানের বাড়ন্ত চালকে নষ্ট করে বড় গুটিকা সৃষ্টি করে। গুটিকার ভিতরের অংশ হলদে-কমলা রঙ এবং বহিরাবরণ সবুজ যা আস্তে আস্তে কালো হয়ে যায় (চিত্র ৫২)। এ রোগ ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে ভাল উপায় হলো-

- রোগাক্রান্ত শিষ তুলে ফেলা।
- মাত্রাতিরিক্ত ইউরিয়া সার ব্যবহার না করা।
- আক্রমণপ্রবণ ধানের জাত কোন অবস্থাতেই ধান-ভূট্টা শস্যক্রমে চাষ না করা।
- সুষম মাত্রায় পটাশ সার ব্যবহার করুন।

চিত্র ৫২। লক্ষীর গু রোগের লক্ষণ।

চিত্র ৫৩। পাতার লালচে রেখা রোগের লক্ষণ।

পাতা লালচে রেখা (Bacterial leaf streak)

এটি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ। ব্যাকটেরিয়া পাতার ক্ষত দিয়ে প্রবেশ করে এবং শিরার মধ্যবর্তী স্থানে সরু রেখার জন্ম দেয়। আস্তে আস্তে রেখা বড় হয়ে লালচে রঙ ধারণ করে (চিত্র ৫৩)। পাতা সূর্যের বিপরীতে ধরলে দাগের ভিতর দিয়ে স্বচ্ছ আলো দেখা যায়। এ রোগ ব্যবস্থাপনার জন্য বীজ শোধন করা, আক্রান্ত জমি থেকে বীজ সংগ্রহ করা হতে বিরত থাকা এবং নাড়া পুড়িয়ে ফেলা।

এক নজরে ধানের রোগ শনাক্তকরণ পদ্ধতি

সমস্যা	শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য
নাইট্রোজেনের অভাব	জমিতে সব জায়গায় ধানগাছ হলদে হয়ে যায়, কুশি কম এখানে-সেখানে বিক্ষিপ্ত নয়, ইউরিয়া দিলে সবুজ হয়।
গন্ধকের অভাব	সারা মাঠে কচি পাতা হলদে বা হালকা হলদে বিবর্ণতা, মাঠের নিচু জায়গায় বেশি, গাছ কিছুটা বেঁটে, জিপসাম সার দিলে ভাল হয়।
দস্তার অভাব	ধানগাছের কচি পাতার গোড়ার দিকে মধ্যশিরা বরাবর সাদা হয় যা পরে ব্রোনজিং বা মরচে দাগ পড়ে, বিক্ষিপ্ত অবস্থায় গাছগুলো বসে যায়, জিঙ্ক সালফেট বা দস্তা প্রয়োগ করলে গাছ ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে যায়।

সমস্যা	শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য
বাদামি দাগ	দাগ আলপিনের মাথার আকৃতি হতে তিল বীজের মতো ছোট, অনিয়মিত এবং কিনারা বাদামি রঙের, কোন কোন সময় কেন্দ্র ধূসর হয়। বালুময় জমিতে পানি ও নাইট্রোজেন সারের অভাবে এ রোগের প্রকোপ বেশি হয় এবং পাতায় ও দানায় দাগ পড়ে।
ব্লাস্ট	পাতায় চোখের মতো গোলাকার বা ত্রি-কোণাকৃতি দাগ চারদিক বাদামি ও কেন্দ্র সাদা বা ধূসর। শিষ সম্পূর্ণ সাদা, শিষের গোড়া পচে গাঢ় বাদামি দাগ হয়, শিষ টান দিলে সহজে উঠে না। দুধ ভরা অবস্থায় আক্রান্ত হলে শিষ ভেঙ্গে পড়ে এবং শিষের ধান অপুষ্ট হয়। ব্লাস্ট আক্রান্ত ধান গাছের গিঁটে কালো দাগ দেখা যায়।
খোলপোড়া	ধানের গোড়া থেকে উপরের দিকে খোল ও পাতায় গোখরো সাপের চামড়ার মতো ছোপ ছোপ বা চক্রা-বক্রা দাগ দেখা যায়। নিবিড় ধান চাষ এবং অতিরিক্ত মাত্রায় ইউরিয়া ব্যবহারে এ রোগ ব্যাপকভাবে মাঠে ছড়িয়ে পড়ে।
বাকানি	আক্রান্ত ধানগাছ বা কুশি অন্যান্য ধানগাছের চেয়ে লম্বা, হালকা সবুজ, দুর্বল বিধায় অন্য গাছের উপর হেলে পড়ে। মাটির উপরিভাগের গিঁটে ও পাতার খোলে শিকড় গজায়। আক্রান্ত গাছের শিষ আগে বের হয়।
কাণ্ডপচা	পানির তল বরাবর ধানগাছের গোড়ার দিকে বাইরের খোলে প্রাথমিক আক্রমণ শুরু হয়। দাগগুলো কালো আয়তাকার এবং ভিতরের খোল ও কান্ডের ভিতরের দিকে অগ্রসর হয়। আক্রান্ত অংশ কালো হয়ে ভেঙ্গে পড়ে। কাণ্ড ছিঁড়লে ছোট কালো গোল ছত্রাক গুটি দেখা যায়
খোলপচা	থোড় অবস্থায় ডিগপাতার খোলে অনেকগুলো কালো দাগ একত্রিত হয়ে পচে কালো রঙ ধারণ করে। শিষ আংশিক বের হয় এবং অধিকাংশ ধান কালো দাগযুক্ত হয়।
চারাঝলসানো/ চারাপোড়া	সাধারণত শীতকালে বোরো বীজতলায় এ রোগ দেখা যায়। শুকনো বা কম ভেজা বীজতলায় অঙ্কুরিত বীজ ও চারার গোড়ায় সাদা বা বাদামি রঙের ছত্রাক দেখা যায়। আক্রান্ত স্থানে ধীরে ধীরে চারাগুলো লালচে হয়ে মারা যায়।
চারাধসা	বোরো বীজতলায় বেশি পানি থাকলে ও ঠান্ডা আবহাওয়া বিরাজ করলে অঙ্কুরিত চারা সবুজ ছত্রাক দ্বারা আবৃত হয়ে ধীরে ধীরে মারা যায়।
পাতাঝলসানো/ পাতাপোড়া	এটি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ। সাধারণত ঝড়-বৃষ্টির পরে গাছে ক্ষত তৈরি হলে এ রোগ দেখা দেয়। অতি উর্বর জমিতেও এ রোগ হয়। অতিরিক্ত মাত্রায় নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করলে এ রোগ বেশি হয়। শুরুতে পাতার শীর্ষে হলুদাভ দাগ সৃষ্টি হয়। পরে পাতার উপর থেকে ক্রমশ নিচের দিকে এবং পাতার দুই কিনার হতে ভিতরের দিকে বা মধ্য শিরা বরাবর হলুদাভ দাগ বৃদ্ধি পায় যা দূর থেকে দেখতে খড়ের মতো মনে হয়।
পাতার লালচে রেখা	আক্রান্ত পাতার শিরা বরাবর লম্বালম্বি সাদা বা হলদে রেখা দাগ দেখা যায় যা পরে কমলা রঙ ধারণ করে। সূর্যের বিপরীতে ধরলে আলো দেখা যায়।
উফরা	ধানগাছের বর্ধিষ্ণু অংশে এ রোগের প্রাথমিক আক্রমণ শুরু হয়। গজানো নতুন পাতার গোড়ার দিকে প্রাথমিক অবস্থায় ছিটেফোঁটা সাদা দাগ দেখা যায়। শিষ বের হতে পারে না আর বের হলেও শিষ কোঁকড়ানো ও শিষে ধান পুষ্ট কম হয়। জলমগ্ন বা জোয়ার-ভাটা অঞ্চলের ধানে এ রোগ বেশি হয়।
শিকড়গিঁট	সুনিষ্কাশিত বেলে ও বেলে-দোআঁশ মাটিতে এ রোগ দেখা যায়। আক্রান্ত গাছের শিকড়ে গিঁট হয় ফলে গাছ মাটি হতে প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদান সংগ্রহ করতে পারে না। খাদ্যের অভাবে গাছ হলুদাভ রঙ ধারণ করে এবং খাটো হয়ে যায়। পাতা ও ধানে বাদামি দাগ দেখা যায়।
টুংরো	ভাইরাসজনিত রোগ। জমিতে ধানগাছ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় শুরুতে হলুদ ও পরে কমলা রঙ ধারণ করে বসে যায়। আক্রান্ত গোছায় সুস্থ গাছের তুলনায় কুশির সংখ্যা বেশি হয়। নাইট্রোজেন ও গন্ধক সার ব্যবহার করেও হলুদাভ দাগ দূর হয় না। আক্রান্ত ধান ক্ষেতে সবুজ পাতাফড়িং দেখা যেতে পারে।

ফসল কাটা, মাড়াই ও সংরক্ষণ

অধিক পাকা অবস্থায় ফসল কাটলে অনেক ধান ঝরে পড়ে, শিষ ভেঙ্গে যায়, শিষকাটা লেদাপোকা এবং পাখির আক্রমণ হতে পারে। তাই মাঠে গিয়ে ধান পেকেছে কিনা তা দেখতে হবে। শিষের শতকরা ৮০ ভাগ ধানের চাল শক্ত ও স্বচ্ছ হলে ধান ঠিকমতো পেকেছে বলে বিবেচিত হবে। কাটার পর ধান মাঠে ফেলে না রেখে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাড়াই করা উচিত। কাঁচা খলার উপর ধান মাড়াই করার সময় চাটাই, চট বা পলিথিন বিছিয়ে দিন। এভাবে ধান মাড়াই করলে ধানের রঙ উজ্জ্বল ও পরিষ্কার থাকে। মাড়াই করা ধান অন্তত ৪-৫ দিন রোদে ভালভাবে শুকানোর পর ঝেড়ে গোলাজাত করুন।

ধানের বীজ সংরক্ষণ

ভাল ফলন পেতে হলে ভাল বীজের প্রয়োজন। এজন্য যে জমির ধান ভালভাবে পেকেছে, রোগ ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণ হয়নি এবং আগাছামুক্ত সে সব জমির ধান বীজ হিসেবে রাখার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এবার ধান কাটার আগেই বিজাতীয় (Off-type) গাছ সরিয়ে ফেলতে হবে। যেসব গাছের আকার-আকৃতি, শিষের ধরন, ধানের আকার-আকৃতি, রঙ ও শুঙ এবং ধান পাকার সময় জমির অধিকাংশ গাছ থেকে একটু আলাদা সেগুলোই বিজাতীয় গাছ। সকল রোগাক্রান্তগাছও অপসারণ করতে হবে। এরপর ফসল কেটে এবং আলাদা মাড়াই, ঝাড়াই করে ভালভাবে রোদে শুকিয়ে মজুদ করতে হবে। বীজ ধান মজুদের সময় যেসব পদক্ষেপ নেয়া উচিত সেগুলো হলো-

- রোদে ৫/৬ দিন ভালভাবে শুকিয়ে নিতে হবে যেন বীজের আর্দ্রতা শতকরা ১২ ভাগের নিচে থাকে। দাঁত দিয়ে বীজ কাটলে যদি কটকট শব্দ হয় তাহলে বুঝতে হবে বীজ ঠিকমতো শুকিয়েছে।
- পুষ্ট ধান বাছাই করতে কুলা দিয়ে কমপক্ষে দু'বার ঝেড়ে নেওয়া যেতে পারে।
- বায়ুরোধী পাত্রে বীজ রাখা উচিত। বীজ রাখার জন্য প্লাস্টিকের ড্রাম উত্তম তবে বায়ুরোধী মাটি বা টিনের পাত্রে রাখা যায়।
- মাটির মটকা বা কলসে বীজ রাখলে গায়ে দু'বার আলকাতরার প্রলেপ দিয়ে শুকিয়ে নিতে হবে।
- আর্দ্রতা রোধক মোটা পলিথিনেও বীজ মজুদ করা যেতে পারে।
- রোদে শুকানো বীজ ঠাণ্ডা করে পাত্রে ভরতে হবে। পুরো পাত্রটি বীজ দিয়ে ভরে রাখতে হবে। যদি বীজে পাত্র না ভরে তাহলে বীজের উপর কাগজ বিছিয়ে তার উপর শুকনো বালি দিয়ে পাত্র পরিপূর্ণ করতে হবে।
- পাত্রের মুখ ভালভাবে বন্ধ করতে হবে যেন বাতাস ঢুকতে না পারে। এবার এমন জায়গায় রাখতে হবে যেন পাত্রের তলা মাটির সংস্পর্শে না আসে।
- টন প্রতি ধানে ৩.২৫ কেজি নিম, নিশিন্দা বা বিষকাটালি পাতার গুঁড়া মিশিয়ে গোলাজাত করলে পোকার আক্রমণ হয় না।
- বীজের ক্ষেত্রে ন্যাপথালিন বল ব্যবহার করা যায় তবে অবশ্যই বীজ ধান প্লাস্টিক ড্রামে সংরক্ষণ করতে হবে।

ধানের ফলন ব্যবধান

গবেষণা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানীগণ উন্নত ধানের জাত ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেন। এসব প্রযুক্তি ব্যবহার করে গবেষণা খামারে কিংবা অনুকূল পরিবেশে কৃষকের প্রদর্শনী মাঠেও ভাল ফলন পাওয়া যায়। কিন্তু কৃষকের মাঠে সাধারণত গবেষণা খামারের চেয়ে অনেক কম ফলন পাওয়া যায়। যেমন বোরো মৌসুমে ব্রি ধান২৮ ৬.৫ টন/হেক্টর ও ব্রি ধান২৯ প্রায় ৯-১০ টন/হেক্টর ফলনের ক্ষমতা রাখে। এটাই সম্ভাব্য বা অর্জনযোগ্য ফলন। অথচ আমাদের জাতীয় গড় ফলন হেক্টরপ্রতি মাত্র ৪.২ টন। সম্ভাব্য বা অর্জনযোগ্য ফলন এবং গড় ফলনের মধ্যে যে পার্থক্য, তাই ফলন ব্যবধান। বর্তমানে আমাদের দেশে ধান চাষে ফলন ব্যবধান কমিয়ে আনার জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে। যথাযথ চাষাবাদ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ধানের ফলন বহুলাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব।

ব্রি থেকে প্রকাশিত *'আধুনিক ধানের চাষ'* বইটিতে এবং বাংলাদেশ রাইস নলেজ ব্যাংকে (www.knowledgebank-brri.org) জমির প্রয়োজন অনুযায়ী মৌসুম-ভিত্তিক যথাযথ প্রযুক্তি নির্বাচন বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে।

কারণ

ফলন ব্যবধানের বহুবিধ কারণ আছে। যে কারণে কৃষক অর্জনযোগ্য ফলন পাচ্ছে না সেগুলো মূলত তিন ধরনের–

জৈব-ভৌতিক : ফলন ব্যবধানের জৈব-ভৌতিক কারণের মধ্যে আছে বীজ, সার, পানি ও মাটি ইত্যাদি। ভাল মানের বীজ ব্যবহার না করা, অনুমোদিত মাত্রায় ও পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ না করা এবং সঠিক পদ্ধতিতে পানি ব্যবস্থাপনা না করা ইত্যাদি কারণে সম্ভাব্য ফলন পাওয়া যায় না।

পরিচর্যা : সঠিক বয়সের চারা, সঠিক সময়ে ও নিয়মে রোপণ, সময়মতো সার প্রয়োগ ও অন্যান্য পরিচর্যা না করায় ফলন কম হয়। তাছাড়া সময়মতো ধান কাটা ও ফলনোত্তর প্রযুক্তি অনুসরণ না করাও ফলন কম হওয়ার কারণ।

আর্থ-সামাজিক : ধান উৎপাদন প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞানের তারতম্যই ফলন ব্যবধানের অন্যতম প্রধান কারণ। তাছাড়া অনুমোদিত মাত্রায় উৎপাদন উপকরণ যেমন সার, পানি, কীটনাশক ইত্যাদি সংগ্রহ ও ব্যবহারে কৃষকের অক্ষমতা আমাদের দেশের ধানের ফলনের ব্যাপক তারতম্য ঘটায়।

প্রতিকার

জাত নির্বাচন : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অনেকগুলো ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। আপনার এলাকা, মাটি, পরিবেশ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপযোগী সঠিক জাত নির্বাচন করুন। একই এলাকায় শুধু এক-দুটি জাত চাষ না করে অনেকগুলো জাত আবাদ করা প্রয়োজন। এতে করে রোগবালাই এবং প্রতিকূল আবহাওয়া মোকাবিলা করা সহজ হয়।

ভাল মানের বীজ ব্যবহার : ভাল বীজ ভাল ফলনের ভিত্তি। পরিপুষ্ট, মিশ্রণমুক্ত, রোগ-জীবাণুমুক্ত, অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতাসম্পন্ন এবং প্রত্যায়িত বীজ ব্যবহার করা ভাল। আপনি নিজেই ভালমানের বীজ বাছাই করে বীজ উৎপাদন ও ব্যবহার করতে পারেন।

চারা উৎপাদন : সুস্থ ও সবল চারা পেতে হলে আদর্শ বীজতলা তৈরি করবেন। প্রতি শতাংশে বীজতলায় ৩.০-৩.৫ কেজি বীজ ফেলতে হবে। আমন মৌসুমে জাতভেদে ২৫-৩০ দিন এবং বোরো মৌসুমে ৪০-৫০ দিন বয়সের চারা রোপণ করা চাই। স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন জাতের চারার বয়স কিছুটা কম হবে। স্বাস্থ্যবান চারার জন্য বীজতলায় পর্যাপ্ত সার ও পানি ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য পরিচর্যা যথারীতি করতে হবে।

জমি তৈরি ও রোপণ : বোরো মৌসুমে ২৫ ডিসেম্বর থেকে ৭ জানুয়ারি এবং আমন মৌসুমে মধ্য জুলাই থেকে মধ্য আগস্টের মধ্যে চারা রোপণ সম্পন্ন করতে হবে। গোছাপ্রতি ২-৩টি চারা ১৫ × ২০ সেন্টিমিটার দূরত্বে রোপণ করবেন। উত্তমরূপে চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে, যাতে আগাছা ও খড়কুটো ভালভাবে পচে যায়। রোপণের পূর্বে জমি সমতল হওয়া চাই। কেননা এতে সার ও পানির সুষম ব্যবহার নিশ্চিত হবে এবং আগাছা কম হবে। সমতল জমিতে একই সময়ে ফসল পাকবে যা সামগ্রিকভাবে ফলন বৃদ্ধিতে সহায়ক।

সার ব্যবস্থাপনা : কাঙ্ক্ষিত ফলনের জন্য সুষম সার প্রয়োগ করতে হবে। প্রচুর পরিমাণে জৈব সার ব্যবহার করতে হবে। বিশেষত উর্বরতার মান, ধানের জাত ও তার জীবনকাল এক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনায় রাখতে হবে। তাছাড়া সার প্রয়োগের সঠিক সময় ও ব্যবস্থাপনাও গুরুত্বপূর্ণ। সারের মাত্রা ও প্রয়োগবিধি সারণী ৬, ৭, ৮ ও ৯-এ দেখুন।

পানি ও আগাছা ব্যবস্থাপনা : রোপণ থেকে শুরু করে কাইচথোড় আসা পর্যন্ত জমিতে ছিপছিপে পানি রাখা ভাল। কাইচথোড় আসা শুরু হলে পানির পরিমাণ দ্বিগুণ করতে হবে। আবার ধানের দানা শক্ত হওয়া শুরু করলেই জমি থেকে পানি সরিয়ে দিতে হবে। সার উপরিপ্রয়োগের সময় জমিতে ছিপছিপে পানি থাকা আবশ্যক, যাতে সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।

ধানের জমিতে স্বল্প পরিমাণ পানি থাকলে আগাছার উপদ্রব বেশি হতে পারে এবং এতে আগাছা দমন খরচ বেশি হয়। এজন্য ৩-৫ সেন্টিমিটার দাঁড়ানো পানি রাখা দরকার। আলো, পানি ও পুষ্টির জন্য আগাছা ধানগাছের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়, এজন্য জমি আগাছামুক্ত রাখা চাই। আমন মৌসুমে চারা রোপণের পর অন্তত ৪০-৫০ দিন জমি আগাছামুক্ত রাখা দরকার। এজন্য প্রয়োজনে সতর্কতার সঙ্গে আগাছানাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।

কীটপতঙ্গ ও রোগবালাই দমন : অন্যান্য সকল পরিচর্যা যথারীতি করা সত্ত্বেও কীটপতঙ্গ ও রোগবালাই ধানের ফলন ব্যাপকভাবে কমিয়ে দিতে পারে। সেজন্য সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করা দরকার। আমন মৌসুমে ক্ষতিকর পোকার আক্রমণে ১৩-১৪ ভাগ ফলনহানি হতে পারে।

ফলনোত্তর কার্যক্রম : ধানের ছড়ার ওপরের দিকে শতকরা ৮০ ভাগ ধানের চাল শক্ত ও স্বচ্ছ হলেই ধান পেকেছে বলে বুঝতে হবে এবং বিলম্ব না করে ধান কাটতে হবে। অন্যথায়

ফলন হ্রাস পাবে। কাটার পর মাড়াই যন্ত্র দিয়ে মাড়াই করা সহজ। পরিষ্কার জায়গায় ধান মাড়াই করা উচিত। ধান মাড়াই করার পর ভালভাবে শুকিয়ে এবং ঝেড়ে সংরক্ষণ বা বাজারজাত করা দরকার। আমাদের দেশে গড়ে শতকরা ১২-১৩ ভাগ ফসলহানি ঘটে ফলনোত্তর পর্যায়ে।

আয়-ব্যয় : ব্রির সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুযায়ী বর্তমানে দেশে ভাল আবাদ হলে ধান চাষে বিঘাপ্রতি ২,৫০০ টাকার বেশি আয় করা সম্ভব।

ব্রি হাইব্রিড ধানের চাষাবাদ পদ্ধতি

বীজতলা তৈরি ও বীজ বপন

- উফশী ধানের বীজতলা তৈরি পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে তবে বীজতলায় জৈব সার প্রয়োগ করা বাধ্যতামূলক। বীজতলার প্রতি বর্গমিটারে ২ কেজি পচা গোবর বা পচা আবর্জনা সার প্রয়োগ করতে হবে। তাছাড়া চারা সুস্থ ও সবল রাখতে জমি তৈরির সময় প্রতি বর্গমিটারে ৪ গ্রাম টিএসপি, ৭ গ্রাম এমওপি এবং বীজ বোনার ১০ দিন পরে ৭ গ্রাম ইউরিয়া ও ১০ গ্রাম জিপসাম সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন।
- হাইব্রিড ধানের বীজ বপন করতে হবে ১৫ নভেম্বর হতে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে।

জমি তৈরি

- উর্বর জমি, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ও সেচের সুবিধা রয়েছে এমন জমি নির্বাচন করতে হবে।
- চারা রোপণের জন্য উত্তমরূপে চাষ ও মই দিয়ে মাটি কাদাময় করে নিতে হবে।
- শেষ চাষ ও মই দেওয়ার সময় লক্ষ রাখতে হবে যেন জমি যথেষ্ট সমতল হয় এবং অনুমোদিত হারে সার প্রয়োগ করতে হবে (সারণী ১৩)।

সারণী ১৩। হাইব্রিড ধানের চাষাবাদে অনুমোদিত সারের মাত্রা ও প্রয়োগ পদ্ধতি।

সার	পরিমাণ (কেজি/বিঘা)		প্রয়োগ মাত্রা
	বোরো	আমন	
ইউরিয়া	৩৬	২৬	১/৪ অংশ শেষ চাষের সময় ১/৪ অংশ চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পর ১/৪ অংশ ৩৫-৪০ দিন পর এবং অবশিষ্ট ১/৪ অংশ কাইচথোড় আসার সময়
টিএসপি বা ডিএপি	১৭	৮	শেষ চাষের সময়
এমওপি	১৬	১০	২/৩ অংশ শেষ চাষের সময় এবং ১/৩ অংশ দ্বিতীয় কিস্তির সময়
জিপসাম	১৫	৮	শেষ চাষের সময়
দস্তা (জিঙ্ক সালফেট)	২	০	শেষ চাষের সময়

চারা রোপণ

- রোপণের সময় জমিতে ছিপছিপে পানি রাখতে হবে এবং গোছাপ্রতি ১ বা ২টি করে সুস্থ ও সবল চারা রোপণ করতে হবে।
- ৩০-৩৫ দিনের চারা ১৫ জানুয়ারির মধ্যে রোপণ করতে হবে।
- সারিতে চারা রোপণ করতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব ২০ সেন্টিমিটার (৮ ইঞ্চি) এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব হবে ১৫ সেন্টিমিটার (৬ ইঞ্চি)।
- রোপণের ৩ থেকে ৫ দিনের মধ্যে মরে যাওয়া চারার স্থলে পুনরায় নতুন চারা রোপণ করতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা

- হাইব্রিড ধান থেকে প্রত্যাশিত ফলন পেতে জমিতে প্রয়োজনমতো জৈব সার, যেমন গোবর ও পচা আবর্জনা, ধৈঞ্চা বা ডাল জাতীয় ফসল ব্যবহার করা উচিত।
- চারা রোপণের জন্য জমি তৈরির শেষ চাষের সময় টিএসপি/ডিএপি, জিপসাম ও জিঙ্ক সালফেট এবং ২/৩ অংশ এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। শেষ চাষে কিছু ইউরিয়া সারও প্রয়োগ করতে হবে। সারণী ১৩-তে সার প্রয়োগের নিয়ম বর্ণনা কর হলো।
- কাইচথোড় আসার পরেও যদি নাইট্রোজেনের অভাব পরিলক্ষিত হয় তবে বিঘাপ্রতি ৪-৫ কেজি ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগ করা যেতে পারে। জমির উর্বরতার মাত্রা অনুযায়ী সারের মাত্রা কম বা বেশি হতে পারে।

আগাছা দমন ও পানি ব্যবস্থাপনা

সার উপরিপ্রয়োগের আগে অবশ্যই জমির আগাছা পরিষ্কার করে নিতে হবে এবং সার প্রয়োগের পর তা মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। হাত দিয়ে বা উইডার দিয়ে অথবা আগাছানাশক প্রয়োগে আগাছা দমন করা যেতে পারে। চারা রোপণের পর থেকে জমিতে ৫-৭ সেন্টিমিটার (২-৩ ইঞ্চি) পানি রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। ধানগাছে যখন কাইচথোড় আসা শুরু করে তখন পানির পরিমাণ কিছুটা বাড়ানো উচিত। এ অবস্থায় খরায় পড়লে ধানে চিটার পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : যদি কোন কৃষক তাঁর জমিতে টিএসপি সারের পরিবর্তে ডিএপি সার ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে বিঘাপ্রতি ৩৬ কেজির স্থলে ২৮ কেজি ইউরিয়া সার ব্যবহার করবেন এবং তা তিন কিস্তিতে উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। সার উপরিপ্রয়োগের সময় জমিতে ছিপছিপে পানি রাখতে হবে। সার সমভাবে ছিটানোর পর হাতড়িয়ে বা নিড়ানি দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। সার প্রয়োগকালে জমিতে অতিরিক্ত পানি থাকলে তা বের করে দিতে হবে এবং সার প্রয়োগের ২-৩ দিন পর জমিতে পর্যাপ্ত পানি রাখতে হবে।

হাওড় এলাকায় আকস্মিক বন্যা মোকাবিলা

দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের হাওড় এলাকায় পাকা, আধা-পাকা বোরো ধান আকস্মিক বন্যায় তলিয়ে যায়। সাধারণত বৈশাখের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে এ ঢল শুরু হয়। এভাবে ফসল হানি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জমির অবস্থান ও ঢল নামার সময় বুঝে উপযুক্ত ধানের জাত নির্বাচন করতে হবে। তাছাড়া সঠিক সময়ে বীজতলায় বীজ বপন করে ৩৫-৪৫ দিনের চারা রোপণ করতে হবে।

উচ্চ ফলনের কারণে বিআর১৯ এবং ব্রি ধান২৯ হাওড় এলাকায় সবচেয়ে জনপ্রিয়। কিন্তু দু'টি জাতই দীর্ঘমেয়াদি বিধায় নিরাপদে ফসল ঘরে তুলতে দরকার ব্রি ধান৪৫ এর মতো স্বল্পমেয়াদি জাত। সুনামগঞ্জের শাল্লা, জামালগঞ্জ এবং বিশ্বম্ভরপুরের হাওড় এলাকায় কৃষকদের অংশীদারিত্বে জাত নির্বাচন পরীক্ষায় এ জাতের ভাল ফল পাওয়া গেছে। সুতরাং হাওড় এলাকায় নতুন জাতটি জনপ্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিআর১৯ বা ব্রি ধান২৯-এর চেয়ে ব্রি ধান৪৫ পনের থেকে বিশ দিন আগে পাকে এবং প্রায় সমান ফলন দিয়ে থাকে। ব্রি ধান২৯ এর পরিপূরক হিসেবে অপেক্ষাকৃত আগাম ব্রি ধান৫৮ও ওই এলাকায় চাষ করা যেতে পারে।

তীব্র শীতে বোরো ফসলের জরুরি পরিচর্যা

বোরো মৌসুমে চারা অবস্থায় শৈত্য প্রবাহ হলে চারা মারা যায় (চিত্র ৫৪)। কুশি অবস্থায় শৈত্য প্রবাহ হলে কুশির বাড়-বাড়তি কমে ও গাছ হলুদ হয়ে যায়। আবার থোড় বা শিষ পুরোপুরি বের হতে দেয় না, শিষের অগ্রভাগের ধান মরে যায় এবং শিষে চিটার পরিমাণ অস্বাভাবিক বেড়ে যায়। এছাড়াও ঠাণ্ডার প্রকোপে ধসে পড়া রোগের জন্য চারা মারা যায়। প্রতিকারের জন্য করণীয়-

- বীজতলায় ৩-৫ সেন্টিমিটার পানি ধরে রাখা (চিত্র ৫৫) এবং স্বচ্ছ পলিথিনের ছাউনি দিয়ে বীজতলা ঢেকে রাখতে হবে।
- শৈত্য প্রবাহের সময় বীজতলা স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঢেকে দিলে, বীজতলার পানি সকালে বের করে দিয়ে আবার নতুন পানি দিলে, প্রতিদিন সকালে চারার উপর জমাকৃত শিশির ঝরিয়ে দিলে (চিত্র ৫৬) চারা ঠাণ্ডার প্রকোপ

চিত্র ৫৪। শৈত্য প্রবাহের কারণে মরা চারা।

চিত্র ৫৫। বীজতলায় ৩-৫ সেন্টিমিটার পানি।

থেকে রক্ষা পায় এবং স্বাভাবিকভাবে বাড়তে পারে।

- চারা রোপণকালে শৈত্য প্রবাহ শুরু হলে কয়েক দিন দেরি করে তাপমাত্রা স্বাভাবিক হলে চারা রোপণ করতে হবে।
- রোপণের পর শৈত্য প্রবাহ হলে জমিতে ৫-৭ সেন্টিমিটার পানি ধরে রাখতে হবে।
- কুশি অবস্থায় শৈত্য প্রবাহ শুরু হলে জমিতে ৫-৭ সেন্টিমিটার পানি ধরে রাখতে হবে।
- রোপণের জন্য কমপক্ষে ৩৫-৪৫ দিনের চারা ব্যবহার করতে হবে। এ বয়সের চারা রোপণ করলে শীতে চারার মৃত্যুর হার কমে, চারা সতেজ থাকে এবং ফলন বেশি হয়।

চিত্র ৫৬। স্বচ্ছ পলিথিনের ছাউনি দিয়ে ঢেকে রাখা বীজতলা।

- থোড় ও ফুল ফোটার সময় অতিরিক্ত ঠাণ্ডা আবহাওয়া বিরাজ করলে ক্ষেতে ১৫-২০ সেন্টিমিটার দাঁড়ানো পানি রাখলে থোড় সহজে বের হয় এবং চিটার পরিমাণ কমে।

বোরো ধানে অতিরিক্ত চিটা : কারণ ও প্রতিকার

স্বাভাবিকভাবে ধানে শতকরা ১৫-২০ ভাগ চিটা হয়। চিটার পরিমাণ এর চেয়ে বেশি হলে ধরে নিতে হবে থোড় থেকে ফুল ফোটা এবং ধান পাকার আগ পর্যন্ত ফসল কোনো না কোনো প্রতিকূলতার শিকার হয়েছে, যেমন অসহনীয় ঠাণ্ডা বা গরম, খরা বা অতিবৃষ্টি, ঝড়-ঝঞ্ঝা, পোকা ও রোগবালাই।

ঠাণ্ডা : আগাম বোরোর বেলায় রাতের তাপমাত্রা ১২-১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং দিনের তাপমাত্রা ২৮-২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস (কাইচথোড় থেকে থোড় অবস্থা অবধি) ধান চিটা হওয়ার জন্য মোটামুটি সঙ্কট তাপমাত্রা। তবে এই অবস্থা পাঁচ/ছয় দিন (শৈত্য প্রবাহ) চলতে থাকলেই কেবল অতিরিক্ত চিটা হওয়ার আশঙ্কা থাকে। রাতের তাপমাত্রা সঙ্কট মাত্রায় নেমে আসলেও যদি দিনের তাপমাত্রা ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর বেশি থাকে তবে চিটা হওয়ার আশঙ্কা কমে যায়।

গরম : নিম্ন তাপমাত্রা ফসলের জন্য যেমন ক্ষতিকর, উচ্চ তাপমাত্রাও তেমনি ক্ষতি করে। নাবি বোরোর বেলায় ধানের জন্য অসহনীয় গরম তাপমাত্রা হলো ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ফুল ফোটার সময় ১-২ ঘন্টা উক্ত তাপমাত্রা বিরাজ করলে মাত্রাতিরিক্ত চিটা হয়ে যায়। দেরিতে বোরো ধানের আবাদ করলে অতিরিক্ত চিটা হওয়ার ভয় থাকে। বিশেষ করে মে মাসের প্রথম দিক ধানের ফুল ফোটা অবস্থায় বেশি গরমের মধ্যে পড়লে ধানে অতিরিক্ত চিটা হয়।

ঝড়ো বাতাস : প্রচণ্ড ঝড়ো এবং গরম বাতাসের কারণে গাছ থেকে পানি প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় বেরিয়ে যায়। ফলে গাছ শুকিয়ে যেতে পারে। ঝড়ো বাতাস পরাগায়ণ, গর্ভধারণ ও ধানের মধ্যে চালের বৃদ্ধি ব্যাহত করে। এতে ধানের সবুজ খোসা খয়েরি বা কালো রঙ ধারণ করে। ফলে ধান চিটা হয়ে যেতে পারে।

খরা : খরার কারণে শিষের শাখা বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং বিকৃত ও বন্ধ্যা ধানের জন্ম দেয়ায় চিটা হয়ে যায়।

প্রতিকার

ফসল চক্রে নেমে আসা প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিহত করা কঠিন। ধান একবার চিটা হয়ে গেলে আর কিছু করার থাকে না। কিন্তু এ সমস্যা এড়ানোর জন্য কিছু ব্যবস্থা নেয়া যায়। অগ্রহায়ণের শুরুতে বোরো ধানের বীজ বপন করলে ধানের থোড় এবং ফুল ফোটা অসহনীয় নিম্ন বা উচ্চ তাপমাত্রায় পড়ে না, ফলে ঠাণ্ডা ও গরম এমনকি ঝড়ো বাতাসজনিত ক্ষতি থেকেও রেহাই পাওয়া সম্ভব।

ধান আবাদের যন্ত্রপাতি

কৃষি কাজের জন্য খামার যান্ত্রিকীকরণের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ কম সময়ে, স্বল্প খরচে এবং সুবিধাজনকভাবে ফসল উৎপাদনে যন্ত্রপাতির বিকল্প নেই। এ অধ্যায়ে ব্রি উদ্ভাবিত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ব্রি দানাদার ইউরিয়া প্রয়োগযন্ত্র

দেশের মোট ব্যবহৃত ইউরিয়া সারের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ ধান উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। প্রচলিত পদ্ধতিতে অর্থাৎ হাতে ছিটিয়ে এ সার প্রয়োগ করলে গ্যাস হয়ে বাতাসে উড়ে, চুঁইয়ে মাটির নিচে অথবা পানিতে মিশে অন্যের জমিতে বা খালে চলে গিয়ে অপচয় হয়। অন্যদিকে ধান ক্ষেতে ৬-৮ সেন্টিমিটার কাদা মাটির নিচে ইউরিয়া সার প্রয়োগের মাধ্যমে অপচয় রোধ করে এর কার্যকারিতাও বৃদ্ধি করা যায়।

চিত্র ৫৭। ব্রি দানাদার ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র।

এতে প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় প্রায় ৩০% পর্যন্ত ইউরিয়া সাশ্রয় করা যায়। ইউরিয়া সার গুটি অথবা দানাদার যে আকারেই মাটির নিচে প্রয়োগ করা হোক তা ২-৩ ঘণ্টার মধ্যেই তরল রূপ ধারণ করে। ব্রির ফার্ম মেশিনারি এণ্ড পোস্টহারভেস্ট টেকনোলজি বিভাগের কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় ২০১৩ সালে ব্রি প্রিল্ড বা দানাদার ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্রটি উদ্ভাবন করা হয়। এটি একটি হস্তচালিত যন্ত্র। এর ওজন ৭.৫ কেজি (চিত্র ৫৭) হওয়ায় একজন শ্রমিক সহজেই যন্ত্রটি চালাতে পারে। তাছাড়া যন্ত্রটির দণ্ডের/হাতলের উচ্চতা কম-বেশি করার ব্যবস্থা থাকায় যে কোন উচ্চতার শ্রমিক এটি চালাতে পারে। এক সাথে দুই সারিতে দানাদার ইউরিয়া প্রয়োগ করা যায়। যন্ত্রটি ব্যবহার করে ঘণ্টায় ১.০-১.৫ বিঘা জমিতে দানাদার ইউরিয়া প্রয়োগ করা যায়। এর নির্মাণ কৌশল সহজ হওয়ায় এটি তৈরি, মাঠে চালানোর সময় সমস্যা দূরীকরণ ও সংরক্ষণ করা সহজ। দানাদার ইউরিয়া এক সারি পর পর নির্দিষ্ট দূরত্বে জমিতে প্রয়োগ করতে হয় বিধায় সারি থেকে সারির দূরত্ব ১৮-২২ সেন্টিমিটার ধরে যন্ত্রটি তৈরি করা হয়েছে। এ যন্ত্রের দ্বারা দানাদার ইউরিয়া সার অবিরামভাবে পড়ার কারণে চারা থেকে চারা রোপণের দূরত্ব নির্দিষ্টকরণের প্রয়োজন নেই। যন্ত্রটি চালানোর সময় জমিতে নালা তৈরি এবং বন্ধ করার ব্যবস্থাসহ কাদা মাটির গভীরে দানাদার ইউরিয়া স্থাপন করে তা আবার ঢেকে দেয়া যায়। যন্ত্রের প্রতিটি হপারে ১.৫ কেজি দানাদার ইউরিয়া সার পূর্ণ করে জমির এক প্রান্তে স্থাপন করে অন্য প্রান্তে পৌঁছে পুনরায় এক সারি বাদ দিয়ে পূর্বের ন্যায় চালাতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে, যেন সার প্রয়োগ করা সারিতে পা রাখা না হয়। জমিতে চারা লাগানোর ৫/৭ দিন পর দানাদার ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হয়। যন্ত্রটির বাজার মূল্য ৫,০০০ টাকা।

ব্রি উইডার

এটি সারিবদ্ধভাবে রোপণ করা ধানের আগাছা দমনের যন্ত্র (চিত্র ৫৮)। নারী শ্রমিকদের জন্যও এটি বিশেষভাবে উপযোগী। এ যন্ত্র দিয়ে একজন শ্রমিক ঘন্টায় ১০ শতাংশ জমির আগাছা দমন করতে পারে। দেখা গেছে, হাত বাছাই পদ্ধতির পরিবর্তে এ যন্ত্র ব্যবহারে প্রতি হেক্টরে ১,৫০০ টাকা সাশ্রয় করা যায়।

চিত্র ৫৮। ব্রি উইডার।

ব্রি স্বচালিত ধান-গম কাটা যন্ত্র

এটি স্বচালিত ধান-গম কাটার যন্ত্র যা ১.২ মিটার প্রস্থের রিপার (কাটার অংশ) যুক্ত করে চালানো হয় (চিত্র ৫৯)। স্বচালিত বলে এর আকার ছোট যার ফলে জমিতে ধান কাটার সময় খুব সহজেই চালানো যায়। যন্ত্রটি দিয়ে এক হেক্টর জমির ধান কাটতে ৪–৫ ঘন্টা সময় লাগে। এর জ্বালানি খরচ ০.৫-০৭ লিটার/ঘন্টা।

চিত্র ৫৯। ব্রি স্বচালিত ধান-গম কাটা যন্ত্র।

পাওয়ার টিলার চালিত ব্রি ধান-গম কাটা যন্ত্র

এটি শক্তি চালিত ধান-গম কাটার যন্ত্র যা পাওয়ার টিলারের সাথে সংযোগ করে চালানো যায় (চিত্র ৬০)। এ যন্ত্র দিয়ে ঘন্টায় ১.০-১.৫ বিঘা জমির ধান/গম কাটা যায়। শুকনো জমিতে খাড়া অবস্থায় থাকা যে কোন ধান ও গম কাটা যায়। এ যন্ত্র ব্যবহারে শ্রমিকের কায়িক শ্রম লাঘব হয়। কাটা ধান-গম সারি হয়ে পড়ে এবং সনাতন পদ্ধতির চেয়ে হেক্টর প্রতি ১,২০০ টাকা সাশ্রয় করা যায়।

চিত্র ৬০। পাওয়ার টিলার চালিত ব্রি ধান-গম কাটা যন্ত্র।

ব্রি ওপেন ড্রাম পাওয়ার থ্রেসার

এটি চার অশ্ব-শক্তির ইঞ্জিন/মোটর সংযোজিত ধান মাড়াইয়ের যন্ত্র (চিত্র ৬১)। ধান হাতে ধরে মাড়াই করার ফলে খড় অক্ষত থাকে। এর মাধ্যমে তিনজন শ্রমিক (পুরুষ/নারী) একসাথে ধান মাড়াই করতে পারে। পিটিয়ে মাড়াই পদ্ধতির পরিবর্তে এ যন্ত্র ব্যবহারে প্রতি হেক্টরে ৯০০ টাকা সাশ্রয় করা যায়।

চিত্র ৬১। ব্রি ওপেন ড্রাম পাওয়ার থ্রেসার।

ব্রি ধান-গম পাওয়ার থ্রেসার

এ যন্ত্র দিয়ে ধান এবং গম মাড়াই করা যায় (চিত্র ৬২)। এ যন্ত্রের দু'টি মডেল আছে যেমন- টিএইচ-৭ এবং টিএইচ-৮। টিএইচ-৭ যন্ত্র দিয়ে ঘন্টায় ১৮ মণ ধান এবং ১০ মণ গম মাড়াই করা যায়। পক্ষান্তরে টিএইচ-৮ যন্ত্র দিয়ে ঘন্টায় ২৫ মণ ধান এবং ১৫ মণ গম মাড়াই করা যায়। যন্ত্র দু'টি শ্যালো টিউবওয়েল/পাওয়ার টিলারের ইঞ্জিন/বৈদ্যুতিক মোটর দিয়ে চালানো যায় এবং ধান/গম মাড়াই ও ঝাড়াই একসাথে সম্পন্ন হয়। পিটিয়ে মাড়াই পদ্ধতির পরিবর্তে এ যন্ত্র ব্যবহারে প্রতি হেক্টরে ১,০০০ টাকা সাশ্রয় করা যায়।

চিত্র ৬২। ব্রি ধান-গম পাওয়ার থ্রেসার।

ব্রি পাওয়ার উইনোয়ার

এটি শস্য ঝাড়াই করার একটি যন্ত্র (চিত্র ৬৩)। যন্ত্রটি চালাতে দু'জন শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। এটি ০.৫ অশ্ব ক্ষমতা-সম্পন্ন মোটর দিয়ে চালানো হয়। কুলায় ঝাড়া পদ্ধতির পরিবর্তে এ যন্ত্র ব্যবহারে ১০ গুণ বেশি ধান ঝাড়াই করা যায়।

চিত্র ৬৩। ব্রি পাওয়ার উইনোয়ার।

ব্রি ড্রায়ার

এটি সদ্য মাড়াইকৃত ধান শুকানোর একটি যন্ত্র (চিত্র ৬৪)। এটি দিয়ে একবারে ২০০-৩৫০ কেজি ধান শুকানো যায় এবং এর জন্য সময় লাগে ৭-১০ ঘণ্টা।

চিত্র ৬৪। ব্রি ড্রায়ার।

ব্রি উন্নত চুলা

এটি প্রচলিত গাঁড়া চুলার উন্নত সংস্করণ (চিত্র ৬৫)। হালকা ও ভারী সব ধরনের জ্বালানিই এ চুলায় ব্যবহার করা যায়। এ চুলায় গাঁড়া চুলার তুলনায় শতকরা ৪০-৪৫ ভাগ জ্বালানি খরচ কম হয়।

চিত্র ৬৫। ব্রি উন্নত চুলা।

নেক ব্লাস্ট রোগ দমনে আগাম সতর্কতা

সাধারণত আমন মৌসুমের শেষের দিকে এবং বোরো মৌসুমে ধানের নেক ব্লাস্ট রোগের আক্রমণ বেড়ে যায়। দিনের বেলায় গরম ও রাতে ঠান্ডা, শিশিরে ভেজা সকাল, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, কড়া আবহাওয়া, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি এ রোগের জন্য খুবই উপযোগী। এর ব্যাপকতা সাধারণত আবহাওয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাছাড়া ভেজা জমির চেয়ে শুকনো জমিতে এ রোগের আক্রমণ বেশি হয়। আমন মৌসুমে আবাদকৃত অধিকাংশ সুগন্ধি জাতের পাশাপাশি জোয়ার-ভাটা অঞ্চলের অধিকাংশ মোটা জাতে এবং বোরো মৌসুমে উফশী জাতের মধ্যে ব্রি ধান২৮, ব্রি ধান২৯, ব্রি ধান৬১, ব্রি ধান৬৩ এবং ব্রি ধান৬৪সহ অধিকাংশ লবণ সহিষ্ণু উফশী জাতে প্রায় প্রতি বছরই নেক ব্লাস্ট রোগের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয় (পৃষ্ঠা ৫৯, চিত্র ৪৬)।

সাধারণত কৃষক যখন জমিতে নেক ব্লাস্ট বা শিষ ব্লাস্ট রোগের উপস্থিতি সনাক্ত করেন, তখন জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়ে যায়। সে সময় অনুমোদিত মাত্রায় ওষুধ প্রয়োগ করলেও তেমন কোনো উপকারে আসে না। সেজন্য রোগের অনুকূল অবস্থা বিবেচনার পাশাপাশি এ রোগের জীবাণু যেহেতু দ্রুত বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায়, তাই রোগটি দমনের জন্য কৃষক ভাইদের আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

করণীয়

- যেসব জমির ধান নেক ব্লাস্ট রোগে আক্রান্ত হয়নি, অথচ উক্ত এলাকায় ব্লাস্ট রোগের অনুকূল আবহাওয়া বিরাজ করছে অথবা ইতোমধ্যেই কিছু স্পর্শকাতর আগাম জাতে এ রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষ করা গেছে, সেখানে ধানের শিষ বের হওয়ার সাথে সাথেই (ফুল আসা পর্যায়ে) শেষ বিকালে ছত্রাকনাশক যেমন-ট্রুপার (৫৪ গ্রাম/বিঘা) অথবা নেটিভো (৩৩ গ্রাম/বিঘা) ৭-১০ দিন অন্তর দু'বার আগাম স্প্রে করতে হবে।
- ব্লাস্ট রোগের প্রাথমিক অবস্থায় জমিতে পানি ধরে রাখতে পারলে, এ রোগের ব্যাপকতা অনেকাংশেই হ্রাস পায়।

বাদামি গাছফড়িং দমনে আশু করণীয়

বাচ্চা ও পূর্ণবয়স্ক বাদামি গাছফড়িং (পৃষ্ঠা ৫১, চিত্র ২৯) উভয়ই ধান গাছের গোড়ায় বসে রস শুষে খায়। একসাথে অনেক পোকা রস শুষে খাওয়ার ফলে গাছ প্রথমে হলদে ও পরে শুকিয়ে মারা যায়। এ অবস্থাকে 'হপার বার্ন' বা 'ফড়িং পোড়া' বলে (পৃষ্ঠা ৫১, চিত্র ৩০)। যেসব এলাকার জমিতে বোরো ও আমন মৌসুমে ধানের সর্বোচ্চ কুশি পর্যায় থেকে দানা পুষ্ট পর্যায় পর্যন্ত অধিকাংশ সময় দাঁড়ানো পানি থাকে ও দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন জাত যেমন ব্রি ধান২৯ বা অনুরূপ জীবনকাল সম্পন্ন হাইব্রিড ধান চাষ হয় এবং বিগত বছরগুলোতে বাদামি গাছফড়িংয়ের আক্রমণ হয়েছে সেসব এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে করণীয়ঃ

- বোরো মৌসুমে ফেব্রুয়ারি এবং আমন মৌসুমে আগস্ট মাসের প্রথম থেকেই ধানগাছের গোড়ায় পোকার উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা জরুরি।
- এ সময় ডিম পাড়তে আসা লম্বা পাখা বিশিষ্ট ফড়িং আলোক ফাঁদের সাহায্যে দমন করুন।
- ধানের চারা ঘন করে না লাগিয়ে ২৫ × ১৫ সেন্টিমিটার অথবা ২০ × ২০ সেন্টিমিটার দূরত্বে রোপণ করলে গাছ প্রচুর আলো বাতাস পায়; ফলে পোকার স্বাভাবিক বংশ বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে।
- পরিমিত ইউরিয়া সার ব্যবহার করুন। তবে আক্রমণপ্রবণ এলাকায় অতিরিক্ত ৫ কেজি পটাস সার প্রথম ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগের সময় ব্যবহার করুন এবং জমিতে ভালভাবে মিশিয়ে দিন ।
- ধানগাছের গোড়ায় পোকা দেখা গেলে ক্ষেতে জমে থাকা পানি সরিয়ে জমি শুকিয়ে নিন।
- স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন জাত, যেমন ব্রি ধান২৮ চাষ করলে এ পোকার আক্রমণ এড়ানো যায়।
- বাদামি গাছফড়িংয়ের আক্রমণপ্রবণ এলাকায় কীটনাশক যেমন, মিপসিন ৭৫ ডব্লিউপি, প্লিনাম ৫০ ডব্লিউজি, একতারা ২৫ ডব্লিউজি, এডমায়ার ২০ এসএল, সানমেক্টিন ১.৮ ইসি, এসাটাফ ৭৫ এসপি, প্লাটিনাম ২০ এসপি অথবা অনুমোদিত কীটনাশকের বোতলে বা প্যাকেটে উল্লিখিত মাত্রায় প্রয়োগ করুন। কীটনাশক অবশ্যই গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ডাবল নজল বিশিষ্ট স্প্রেয়ার ব্যবহার করা যেতে পারে (পৃষ্ঠা ৫২, চিত্র ৩১)।
- জমির শতকরা ৫০ ভাগের অধিক গোছায় অন্তত একটি করে মাকড়সা দেখা গেলে কীটনাশক ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ, মাকড়সা বাদামি গাছফড়িং খেয়ে ধ্বংস করে।
- সিনথেটিক পাইরিথ্রয়েড গোত্রের কীটনাশকসমূহ (যেমন সাইপারমেথ্রিন, আলফা-সাইপারমেথ্রিন, লেমডা-সাইহেলোথ্রিন, ডেলটামেথ্রিন ও ফেনভেলারেট) ধান ফসলে ব্যবহার করা যাবে না।
- বাদামি গাছফড়িংয়ের আক্রমণ শুরু হলে গ্রামের সব লোক মিলে এ পোকা দমনের জন্য জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় এ পোকা বংশ বিস্তার করে ধান ফসলের ক্ষতি করতে পারে।

ধানের বীজ প্রাপ্তিস্থান

ব্রি উদ্ভাবিত ধানের জাতসমূহের ব্রিডার বীজ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও ব্যক্তি খাতের প্রতিষ্ঠান ব্রি সদরদপ্তর গাজীপুর থেকে সংগ্রহ করে। পরবর্তী পর্যায়ে এই ব্রিডার বীজ থেকে তারা বর্ধিত আকারে অন্যান্য শ্রেণীর বীজ উৎপাদন করে তা সারা দেশে কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করে। ধান বীজ বিপণন ব্যবস্থা এবং বীজ নেটওয়ার্ক সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে 'বাংলাদেশ রাইস নলেজ ব্যাংকে'। এ নলেজ ব্যাংকের ঠিকানাঃ www.knowledgebank-brri.org।

ব্রি অনুমোদিত কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারকদের ঠিকানা

ভাই ভাই ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ, শ্যামগঞ্জ বাজার, নেত্রকোনা, মোবাইল : ০১৭১৩-৫৪৭৭৪৮

মের্সাস উত্তরণ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কর্স (প্রাঃ) লিঃ, কালিতলা, দিনাজপুর।
মোবাইল : ০১৭১৮-৮৩৫৫৯২, ০১৭২-৭২১৯৯৪৬

মেসার্স কামাল মেশিন টুলস, ছিলীমপুর, বগুড়া
ফোন ০৫১-৬৪০০, মোবাইল : ০১৭১৬-৭০৭১৯৫

সরকার ইঞ্জিনিয়ারিং ইণ্ডাস্ট্রিজ, প্রো: মো: শাহীন, বাস স্ট্যান্ড সান্যাল পাড়া, হাটখোলা রোড, শেরপুর, বগুড়া, মোবাইল : ০১৭১২-৯৭১৯৪১, ০১৭১১-৭১৫০৮৯

মাহবুব ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, বিসিক শিল্প নগরী, জামালপুর, মোবাইল: ০১৭১১-২৩৭৭৮৫

আরকে মেটাল, টেপাখোলা, ফরিদপুর, মোবাইল : ০১৭১০-৯২৮৯৭৭

মিরপুর এগ্রিকালচার ওয়ার্কশপ এন্ড ট্রেনিং স্কুল, (MAWTS) পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা।
ফোন : ৯৮৮২৫৪৪, ৮০১১১০৭, ৮০১৩৮১০, ৯০০২৫৪৪

আলীম ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ, বিসিক শিল্প নগরী, কদমতলী, সিলেট
ফোন : ০৮২১-৮৪০৬৬২, মোবাইল : ০১৭৩৩-২০০১৩৩

দি কুমিল্লা কো-অপারেটিভ কারখানা লিঃ, রানীর বাজার, কুমিল্লা
মোবাইল : ০৮১-৬৫৪২৮, ০১৭১৬০৮৪৫৩২

আলম ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, ৪২/৪, ভজহরি সাহা স্ট্রীট, ওয়ারী, ঢাকা ১১০০
মোবাইল : ০১৭১১৩৫৬০৫৫

নিউ বর্ষা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ, সূত্রাপুর, বগুড়া, মোবাইল: ০১৭১১১৮৪২৮২, ০১৯১১-১৮৪২৮২

জনতা ইঞ্জিনিয়ারিং, সরোজগঞ্জ বাজার, চুয়াডাঙ্গা
মোবাইল : ০১৭১১-৯৬০৮৬১, ০১৭১৪-৮৪৯৯০৫

কৃষিযন্ত্র আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা

The Metal (Pvt) Limited, PBL Tower (14th Floor)
17 North C/A, Gulshan 2, Dhaka 1212
Tel : 8835006, 9893981, 01713038288

Corona Tractors Ltd., Kazi Tower (4th Floor)
86 Inner Circular (VIP) Road, Naya Paltan, Dhaka 1000
Tel : 9362527, 9333764, 01711898667

ACI Motors, ACI Centre, Tejgaon Industrial Area, Dhaka 1208
Tel : 9885694

প্রয়োজনীয় পরিমাপ

ওজন

১ কেজি = ১,০০০ গ্রাম = ১.১ সের (প্রায়) = ২.২০ পাউন্ড (প্রায়)
১ সের = ৯৩৩ গ্রাম (প্রায়)
১ মণ = ৪০ সের = ৩৭ কেজি ৩২৪ গ্রাম (প্রায়)
১ কুইন্টাল = ১০০ কেজি = ২ মণ ২৭.৫ সের
১ মেট্রিক টন = ১,০০০ কেজি = ২৬ মণ ৩১.৭৫ সের (প্রায়)

দৈর্ঘ্য

১ ইঞ্চি = ২.৫৪ সেন্টিমিটার
১ ফুট = ৩০.৪৮ সেন্টিমিটার
১ মিটার = ১০০ সেন্টিমিটার = ৩৯.৩৭ ইঞ্চি = ১ গজ ৩.৩৭ ইঞ্চি
১ মাইল = ১.৬০৯ কিলোমিটার = ১৭৬০ গজ
১ কিলোমিটার = ১,০০০ মিটার = ১০৯৩.৬ গজ

ক্ষেত্রফল

১ বর্গমিটার = ১.২০ বর্গগজ (প্রায়) = ১০.৭৫ বর্গফুট
১ কাঠা = ১.৬৭ শতাংশ = ৬৬.৯ বর্গমিটার
১ বিঘা = ২০ কাঠা = ৩৩.৩৩ শতাংশ (ডেসিম্যাল) = ১,৩৩৮ বর্গমিটার = ০.৩৩৩ একর
১ একর = ৩.০২৫ বিঘা = ১০০ ডেসিম্যাল = ৪,৮৪৬ বর্গগজ = ৪,০৪৭ বর্গমিটার
১ হেক্টর = ২.৪৭ একর = ৭.৪৭ বিঘা = ১০,০০০ বর্গমিটার

তরল পদার্থের মাপ

১ মিলিলিটার = ১ কিউবিক সেন্টিমিটার (সিসি)
১ চামচ = ১ চা চামচ (স্ট্যান্ডার্ড) = ৫ সিসি
১ লিটার = ১,০০০ সিসি
১ লিটার পানির ওজন = ১ কেজি (যদি ঘনত্ব ১ হয়)

ইরি ধান নয়, ব্রি ধান বলুন

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এর অনেক সাফল্য সত্ত্বেও এ প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবিত ধানের জাতগুলোকে অনেকে ভুলক্রমে ইরি ধান এবং এ ধানের মৌসুমকে ইরি-বোরো মৌসুম বলেন। IRRI হলো ফিলিপাইনে অবস্থিত আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সংক্ষিপ্ত নাম। ব্রি উদ্ভাবিত ধানকে ইরি ধান অথবা ইরির সাথে আমাদের একটি মৌসুমের নাম জুড়ে দিয়ে ইরি-বোরো বলাও সমীচীন নয়।

আমাদের প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত ইংরেজি নাম BRRI-এর সাথে ধান শব্দটি যুক্ত করে ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত ধানের নামকরণ করা হয়েছে; যেমন, ব্রি ধান২৭, ব্রি ধান২৮, ব্রি ধান২৯ ইত্যাদি। সারাদেশে সকল মৌসুমে এসব ব্রি ধানের চাষাবাদ হচ্ছে।

এদেশের বিজ্ঞানী ও গণমানুষের অর্জনের স্বীকৃতি এবং জাতি হিসেবে আমাদের আত্মমর্যাদা সমুন্নত রাখার প্রয়োজনে এ ভুল সংশোধন করা জরুরি। তাই ইরি ধানের পরিবর্তে ব্রি ধান এবং ইরি-বোরো পরিহার করে ব্রি-বোরো বলে নিজেদের মর্যাদা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির কাজে শরিক হোন।

প্রয়োজনীয় টেলিফোন নম্বর

১।	মহাপরিচালক	০২-৯২৬৩৮১৫
২।	পরিচালক (গবেষণা)	০২-৯২৬৪০৫৩
৩।	পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা)	০২-৯২৬৩৯৩০
৪।	উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা সমন্বয়কারী	০২-৯২৯৪১২৭
৫।	প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ	০২-৯২৬৩৫৯৪
৬।	প্রধান, জৈব প্রযুক্তি বিভাগ	০২-৯২৬৩৭২৯
৭।	প্রধান, কৌলি সম্পদ ও বীজ বিভাগ	০২-৯২৬৩৭৩৪
৮।	প্রধান, শস্যমান ও পুষ্টি বিভাগ	০২-৯২৯৪১৩৮
৯।	প্রধান, হাইব্রিড রাইস বিভাগ	০২-৯২৬৩৫৭২
১০।	প্রধান, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ	০২-৯২৯৪১৪৮
১১।	প্রধান, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ	০২-৯২৬৩৭১৬
১২।	প্রধান, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ	০২-৯২৬৩৬৬৯
১৩।	প্রধান, উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব বিভাগ	০২-৯২৯৪১৩৩
১৪।	প্রধান, কীটতত্ত্ব বিভাগ	০২-৯২৬৩৬১০
১৫।	প্রধান, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ	০২-৯২৯৪১২২
১৬।	প্রধান, রাইস ফার্মিং সিস্টেমস বিভাগ	০২-৯২৬৩৬১৮
১৭।	প্রধান, কৃষি অর্থনীতি বিভাগ	০২-৯২৬৩৬২৯
১৮।	প্রধান, কৃষি পরিসংখ্যান বিভাগ	০২-৯২৯৪১১২
১৯।	প্রধান, খামার ব্যবস্থাপনা বিভাগ	০২-৯২৯৪১২৯
২০।	প্রধান, খামার যন্ত্রপাতি ও ফলনোত্তর প্রযুক্তি বিভাগ	০২-৯২৯৪১৩১
২১।	প্রধান, কারখানা যন্ত্রপাতি ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ	০২-৯২৯৪১৩২
২২।	প্রধান, ফলিত গবেষণা বিভাগ	০২-৯২৯৪১১১
২৩।	প্রধান, প্রশিক্ষণ বিভাগ	০২-৯২৯৪১২৫
২৪।	প্রধান, প্রকাশনা ও জনসংযোগ বিভাগ	০২-৯২৯৪১৪৯
২৫।	প্রধান, ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, বরিশাল	০৪৩১-৭১৬৩৬/০১৯২২৫৫০৪০০
২৬।	প্রধান, ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, ভাঙ্গা, ফরিদপুর	০৬৩২৩-৫৬৩২৯/০১৫৫২৪৭৬০৫৩
২৭।	প্রধান, ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, কুমিল্লা	০৮১-৬৩২৩১/০১৯১৬৫৭৭৬৬০
২৮।	প্রধান, ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, হবিগঞ্জ	০৪৪৯-৪৪৪৩৮৮৫/০১৭২১৯৬৪০০২
২৯।	প্রধান, ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, রাজশাহী	০৭২১-৭৫০১৬৮/০১৭১৬৭২৯৮৫০
৩০।	প্রধান, ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুর	০৫২১-৬৪৩৪০/০১৭১৯৮৬৮৩৩৩
৩১।	প্রধান, ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, সাতক্ষীরা	০৪৭১-৬৫০৩৮/০১৭৬৫৮২৬০৫২
৩২।	প্রধান, ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, সোনাগাজী	০৪৪৩-৬৬০৩১০১/০১৭২৫৩৯৫৭৪৯
৩৩।	প্রধান, ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, কুষ্টিয়া	০৭১৭-৩২২৮/০১৭১২৬২৬৪৫০